নভেম্বর ২০২৩ ■ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩০

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

বাঙালির জীবনে
নবান্ন উৎসব

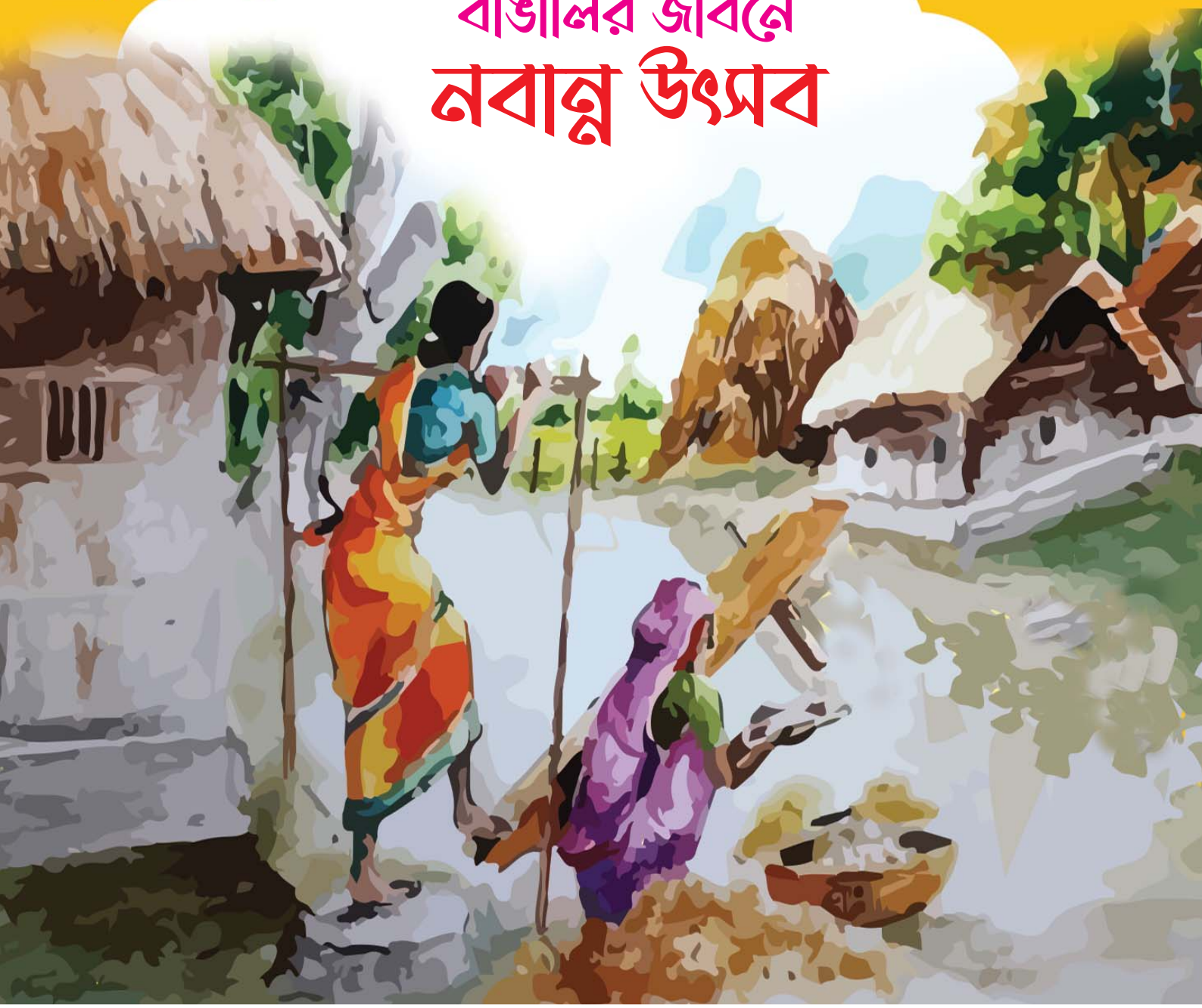

মেহ্‌রিবান বর্ণ, ষষ্ঠ শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা

মির্জা রিজওয়ান আলম, দ্বাদশ শ্রেণি, টেকেরহাট পপুলার হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাদারীপুর

সম্পাদকীয়

হেমন্ত এসেছে। চারিদিকে নবান্নের উৎসব। এরই মাঝে তোমাদের জন্য এল 'নবারুণ'। সবাই হয়ত অপেক্ষা করছো এই সংখ্যার জন্য। ভাবছো কী কী উপকরণ দিয়ে সাজানো হয়েছে নবারুণের এই সংখ্যাটি।

আমাদের এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী রয়েছে। এই সব প্রাণী নিয়ে কৌতূহলেরও শেষ নেই। প্রত্যেক প্রাণিকুলই নিজেরা আলাদাভাবে অবস্থান করে। আবার দেখা যায় ভিন্ন ধরনের প্রাণীদের মধ্যেও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এমনই একটি রূপকথার গল্প অনুবাদ করেছেন কবি হাসান হাফিজ। 'হায়েনা ও অস্ট্রিচ পাখি' নামের এই গল্পটি তোমাদের দারুণ লাগবে আশা করি। তোমাদের জন্য এ সংখ্যায় রয়েছে 'ভুবন মাস্টারের বিনয়' নামে একটি গল্প।

নবান্নের এই সময়ে তোমরা নতুন নতুন পিঠায় মজে আছো। তোমাদের মনকে আরো প্রফুল্ল করতে এ সংখ্যায় নবান্ন নিয়ে লেখা রয়েছে। আরো রয়েছে ছড়া-কবিতা ও তোমাদের জন্য মজার ধাঁধা।

তোমরা সবাই ভালো থাকবে। সুস্থ থাকবে। নবারুণের সাথেই থাকবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৮৮

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

নিবন্ধ

৬ বাঙালির জীবনে নবান্ন উৎসব/ দুখু বাঙাল

৮ আটষট্টি বছর পর আবার লাউয়াছড়ায় স. ম. গোলাম কিবরিয়া

১৪ সোনালি স্বপ্নের দিন/ ডালিয়া ইয়াসমিন

২৪ বাংলা কবিতায় নবান্ন/ কাজী মহম্মদ আশরাফ

৩৯ ভোলা যায় না ভোলাগঞ্জ/ সাবিনা ইয়াসমিন

৪৬ নতুন নামের দেশগুলো/ এটিএম মোস্তফা কামাল

৪৮ জেনে নাও কিছু/ শরিফ উদ্দিন

৫০ অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ব জয়/ মেজবাউল হক

৫২ হাতি বাংলো/ শাহানা আফরোজ

৫৩ বিশ্বের প্রাচীনতম বইমেলা/ রওশন আরা জাহান

৫৭ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

৫৯ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

অনুবাদ গল্প

৪২ হায়েনা ও অস্ট্রিচ পাখি/ হাসান হাফিজ

সাফল্য প্রতিবেদন

৫৪ প্রতীকী দায়িত্ব পালন/ জান্নাতে রোজী

৫৬ কালাজ্বর নির্মূলে বাংলাদেশের সাফল্য মো. জামাল উদ্দিন

৫১ আর্ক এশিয়ায় রৌপ্য জয়/ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ছোটোদের ছড়া

৪৪ সাদিয়া ইসলাম কথা/ জাওয়াদ আলম/ শাহরিয়ার বিনতে সাবাব

৪৫ আবু আহাদ/ লাবিবা তাবস্‌সুম রাইসা

গল্প

৩ নবান্ন ও ভ্যারাইটি স্টোর/ বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

১১ পাখির ডিম/ অমিত কুমার কুণ্ডু

১৯ নবান্ন উৎসবের ভোজে/ আহমেদ রিয়াজ

২২ ভুবন মাস্টারের বিনয়/ জুয়েল আশরাফ

২৮ রাফি ও ময়না/ আজহার মাহমুদ

৩০ মন্টুমামার বাঘ শিকার / জাফর তালুকদার

কবিতাগুচ্ছ

১৩ শাহ আলম বিল্লাল

১৭ আহসানুল হক/ আবদুল আলীম তালুকদার

১৮ মুহাম্মদ ইসমাঈল/ নুসরাত জাহান

২৯ সুজিত হালদার/ শারমিন জিকরিয়া/ শাকিব হুসাইন

৩০ এস ডি সুব্রত/ মো. ইব্রাহিম রাজু

৩৭ ফরিদ সাইদ / মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান সরকার জাহিদুল ইসলাম

৩৮ জানে আলম মুনশী/ ইলিয়াছ হোসেন

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : মেহ্‌রিবান বর্ণ/মির্জা রিজওয়ান আলম

শেষ প্রচ্ছদ : সাফওয়ান-উজ-জামান মন

৫৪ মেহরাব হাসান জারিফ

৬১ মোছা. একি/ রুসাব আল খালিদ

৬২ সানজিদা আক্তার রুপা/ মো. আবিদ

৬৩ রাফসান হক/ জাকোয়ান খান

৬৪ মো. তাহসিন ইসলাম রুহি/ শারিকা তাসনিম নিধি

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (*Nobarun Potrika*) আপলোড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট *www.dfp.gov.bd*-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

গল্প

নবান্ন ও ভ্যারাইটি স্টোর

বাবলু ভঞ্জ চৌধুরী

'এক কেজি নবান্ন হবে?'

'কী বললেন?'

'এক কেজি নবান্ন।'

দোকানদার ভুরু কুঁচকে তাকিয়েই থাকল।

রহমত সাহেব বললেন, 'চোখ কপালে উঠল যে! মনে হচ্ছে ও নাম কখনো শোনোনি! এমন কোনো জিনিস নেই যে তোমার দোকানে নেই, এক কুচি বালু থেকে এন্ড্রোমিডার হিরা সব তো আছে–আর সামান্য

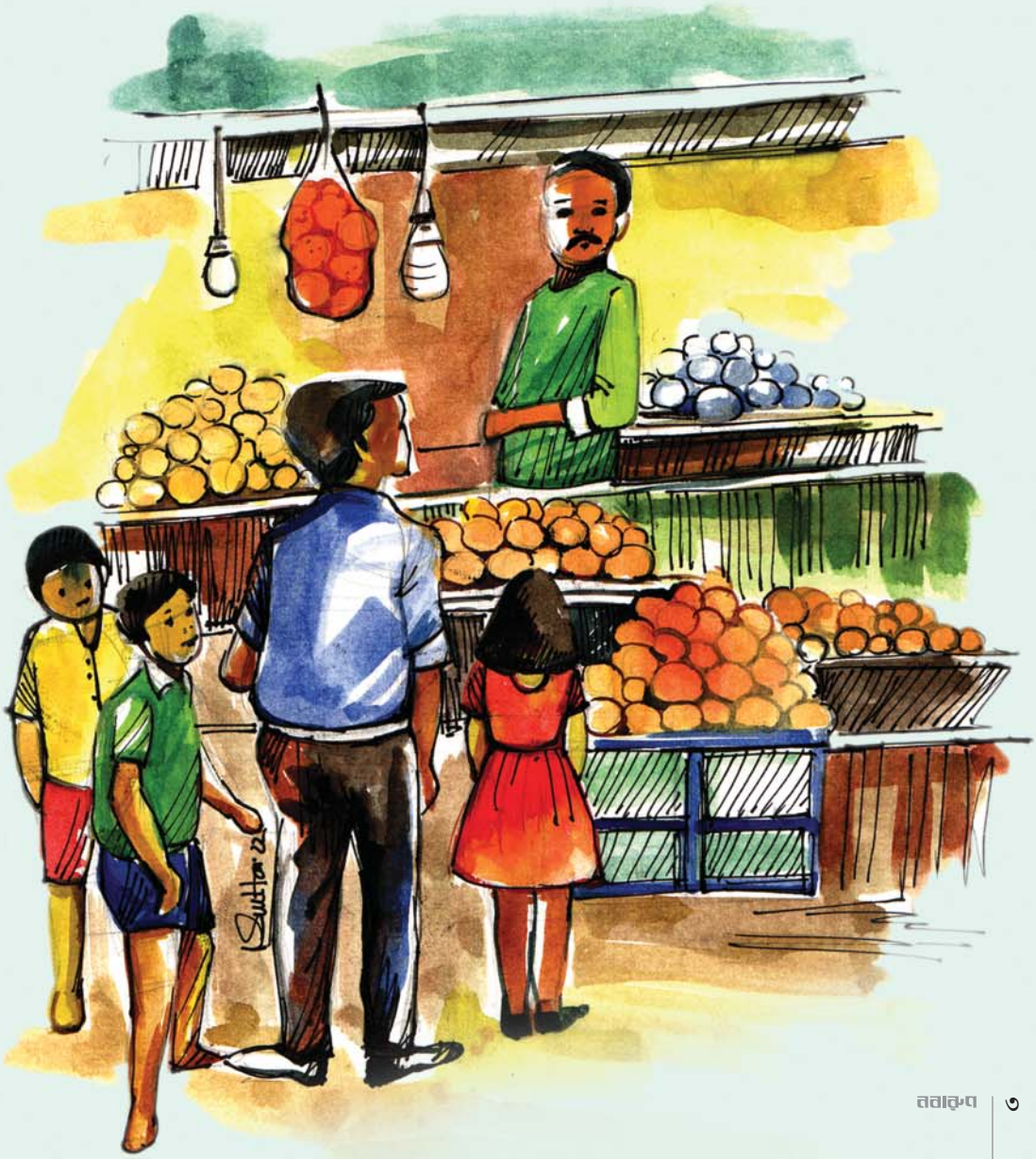

নবান্ন..., শুনেছি মানসম্মানও বিক্রি হয় এখানে, তা...'

'নবান্ন তো অবশ্যই আছে, কিন্তু সে তো কেজিতে বিক্রি হয় না, পিছ হিসেবে হয়।'

'তবে তাই দাও এক পিছ!'

দোকানদার ভেতর থেকে কাগজের একটা প্যাকেট নিয়ে এল।

'এ কী? এ তো মোটরসাইকেলের চেইন!'

'এটাই তো নবান্ন কোম্পানির। সব চেয়ে ভালোটা...।'

'আরে মোটরসাইকেলের চেইন নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আমার চাই নবান্ন। নবান্ন কারে বলে জানো? নতুন আমন ধানের চাউল থেকে তৈরি প্রথম খাবার। তা পিঠা হতে পারে, পায়েস হতে পারে আবার ফিরনিও হতে পারে। তা তিনশ রকমের বিস্কুট ঝুলিয়ে রেখেছ আর একবাটি নবান্ন নেই?'

রহমত সাহেব বিড়বিড় করতে লাগলেন- 'কী যে করি এখন! এ অপমান সহ্য করব কী করে! গণ্ডগোলটা যে মিটে গেল! হায় হায় গণ্ডগোল মিটে গেলে তো চলবে না!'

'কীসের গণ্ডগোল কাকা?'

রহমত সাহেব হালকা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'সে তুমি বুঝবে কী করে! তুমি দোকানদার ছোকরা ভীষণ বিপদে ফেললে!...গণি মোড়ল আমার পারিবারিক শত্রু। ভেবেছে এক গামলা নবান্ন দিয়ে গণ্ডগোল মিটিয়ে নেবে। তা পায়েসটা লেগেছে ভালো, লুকিয়ে একটু খেয়েছিলাম! ছেলে মেয়েরা ওই পায়েস খেয়ে গলে গেল। বলল- কী সুন্দর পায়েস! ওনার সঙ্গে এবার গণ্ডগোল মিটিয়ে নাও।...ছি ছি ছি! পায়েস খেয়েছি, পায়েস ফিরিয়ে দেবো, তাই বলে গণ্ডগোল মিটানো! অতটা গুড় আধসের পাওনি!...'

'কিন্তু কাকা এই ভ্যারাইটি স্টোরে আপনি পায়েস পাবেন না...'

'না না তোমরা তো এর সিন্ডিকেট করেছ দেখছি! কী পাব- কী পাব না তাও তোমরা ঠিক করে দেবে। তোমাদের কারণেই তো বাড়িতে এসব অভ্যাস উঠে যাচ্ছে, আর এখন প্রয়োজনের সময়...'

'কাকা! এক কাজ করুন! কাচ্চি ঘর থেকে এক প্যাকেট বিরিয়ানি নিয়ে যান! প্যাকেটের উপরে লিখে দেবেন-আমন ধানের প্রথম চালের বিরিয়ানি! ব্যাস! ও জিনিস খেলে গণি মিয়ার ঈর্ষা হবে, গণ্ডগোলের স্কেল তখন আপস্কেল হয়ে যাবে!'

রহমত সাহেব মাথা চুলকাতে চুলকাতে ফিরতে লাগলেন।

দুই.

গোবরগোলা ছিটানো উঠোনের মাথায় ঝাঁকড়া বেঁটে একটা লিচুগাছে বসে আছে দুটো কাক। একটা ছোটো, আরেকটা বড়ো। বড়ো কাক ছোটোটার গলা চুলকিয়ে দিচ্ছে।

'নবান্ন কখন খেতে দেবে ভাই?' পাশের কুটোগাদার দিকে তাকিয়ে ছোটো কাক জিজ্ঞেস করল।

বড়ো কাক চোখ মেলে উত্তর দিল, 'এখনো দেরি আছে, দেখছিস না সবে চাল কুটছে, ঢপ ঢপ করে ঢেঁকিতে শব্দ হচ্ছে। রোদের রং এখন কাঁচা সোনা, যখন বাদামি হয়ে আসবে, তখন কোটা শেষ হবে।'

'তাই বুঝি বাড়ির মেয়েরা সব ঢেঁকিশালে, চলো না এই ফাঁকে সাবান চুরি করি!'

'ধুর! আজ নবান্ন উৎসব, কেউ সাবান খায়! ছিঃছিঃ! অন্যদিন আমাদের তাড়িয়ে মারে, আর আজ দেখবি জামাই আদর করবে, ওই যে কলাবাগানে আমাদের আদর করে খেতে দেবে।'

'কিন্তু ওখানে খেতে যাওয়া যে বিপদ, খেঁকি কুকুরটা ওত পেতে থাকবে।'

'তোর যা ভয়! নবান্ন এই দেশের মানুষের উৎসব, এখানকার নিয়ম হলো আগে আমাদেরকে খেতে দেবে, তারপর মানুষেরা খাবে, কাজেই কুকুরের ঝামেলা মানুষেরাই সামলাবে, বুঝলি এটা মানুষের কর্তব্য!'

'আমাদেরকে আগে খেতে দেবে কেন? ক্যা-ক্যা করে যাতে ঝামেলা না করি–তাই?'

'আরে না না! ওদের কী একটা ব্যাপার আছে, পূর্বপুরুষ-টুরুষ ইত্যাদি–আমি ঠিক জানি না, তা সে

যে কারণেই হোক, খাওয়াটা তো দেয়...'

ছোটো কাক কী একটা বলতে যাচ্ছিল, মাঠের সরু পথে নজর আটকে গেল। রহমত সাহেব আসছে।

'ভাই! এ লোকটা অত রাগে রাগে আসছে কেন? হাতে আবার কীসের প্যাকেট দেখেছ?'

'হু। বিরিয়ানির প্যাকেট, ঝগড়াটে লোক!'

'বিরিয়ানির প্যাকেট কেন?'

'ওর বাড়িতে নবান্ন হয় না, এ বাড়ির লোক রীতি অনুযায়ী প্রতিবেশীকে পায়েস দিয়েছে, কিন্তু এনার সঙ্গে ওর গণ্ডগোল, পায়েস দিয়ে যাতে পার না পায়, তাই বিরিয়ানি দিয়ে শোধ দেবে, নবান্ন যে পরস্পরের মিলন ঘটায়, ও লোকটা তা ভুলে যাচ্ছে, লোকটা ইচ্ছা করে গণ্ডগোল-বিবাদ জিইয়ে রাখতে চাইছে।'

'তাহলে তো ব্যবস্থা করতেই হয়,' বলেই ছোটো কাক উড়াল দিল।

রহমত সাহেব গজগজ করছে, 'এই বিরিয়ানি ছুড়ে দেবো! পায়েস দিয়েছিস, ওর আর দাম কত! এটা খেয়ে দ্যাখ!'

ছোটো কাক উড়ে গিয়ে বেলের কাঁটার মতো নলি দিয়ে রহমত সাহেবের মাথার চুল খামছে ধরল। রহমত সাহেব, 'এই যা' ইত্যাদি বলে মাথা সামলাতে সামলাতে ছুটে রাস্তার পাশে নামল। কাকটা তখন রহমতকে ছেড়ে একটা গাছের ডালে গিয়ে বসল, তিরিক্ষি চোখে তাকিয়ে আছে রহমতের দিকে। রহমত সাহেব কাকের চোখের দিকে তাকিয়ে দারুণ ভয় পেলেন। এ যে গণির মায়ের চোখ! মরে গিয়ে কি মরিয়ম বেগম এই কাক হয়ে ফিরে এসেছেন! মনে পড়ল, সেই ছোটোবেলায় এমন এক হেমন্তের সন্ধ্যায় গণিদের উঠোনের কোনায় ধানের গাদার পাশে একথালা পায়েস নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'রহমত, গণি তোর বন্ধু, ওর ওপর রাগ করিস না, আয় নতুন ধানের পায়েস খেয়ে যা!' ❑

গল্পকার

বাঙালির জীবনে

দুখু বাঙাল

বাঙালির নবান্ন উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে তার হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির নানা অনুসঙ্গ। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি জাতি-ধর্ম-বর্ণকে উপেক্ষা করে নবান্নকে কেন্দ্র করে মেতে উঠে নানা অনুষ্ঠানে। নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন অন্ন। নবান্ন উৎসব হলো নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত প্রথম রান্না উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনটিকে ধরে নেওয়া হয় উৎসবের দিন হিসাবে। কোথাও কোথাও কেউ কেউ অগ্রহায়ণ মাসের যে-কোনো একটি দিন বেছে নেন এই উৎসব পালনের জন্য। অনেকে আবার মাঘ মাসেও পালন করেন এই উৎসব। শীতের আমেজের পাশাপাশি গ্রামে হেমন্ত ঋতুতে আরও অনেক দৃশ্য চোখে পড়ে। চোখে পড়ে দিগন্তবিস্তৃত মাঠজুড়ে সোনালি ধানের হিল্লোল। খেজুর রস আর পিঠাপুলির ঘটা। ধান কাটায় ব্যস্ত কৃষক। গ্রামের কৃষক পরিবারের উঠানে ধান সংগ্রহের ধূম পড়ে যায়। উঠানের মাঝ বরাবর বাঁশের খুঁটি গেড়ে সেই খুঁটির চারপাশে ছয়-সাতটি গরু দিয়ে ধান মাড়াইয়ের দৃশ্য অপরূপ। উঠানের এককোণে গর্ত করে অস্থায়ীভাবে তৈরি করা হয় তাফাল। এই তাফালে বিশেষভাবে তৈরি চারকোণা বিশিষ্ট টিনের খোলে রাতভর সিদ্ধ করা হয় ধান। দিনের বেলায় এই ধান শুকাতে দেওয়া হয় উঠানে বা চাতালে। পরবর্তীতে সেই ধানভানা হয় ঢেঁকিতে।

আমার ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি কার্তিক সংক্রান্তিতে জোয়ারের সময় মুসলমানরা 'বিসমিল্লাহ' আর হিন্দুরা 'দুগগা দুগগা' বা 'জয়-মা' বলে কেটে আনত কুটি অগ্রহায়ণি অথবা শাইল গিরমি ধান। এই ধান থেকেই অগ্রহায়ণের প্রথম দিকে হতো নবান্ন। প্রথম কাটা একগোছা ধান বেনি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হতো গৃহস্থ পরিবারের ঘরের আড়াপাইড়ে। কেউ কেউ অতিরিক্ত হিসেবে রাখত কাছারি ঘরে। ধান কাটার দিন ঘরের সামনে রাখা হতো পানি ভরা কলসি– যার মস্তকে শোভা পেত ধান,

দুবলা, আমপাতা আর ফুল। কোনো এক সময় এই অগ্রহায়ণ মাসই ছিল বাংলা সনের প্রথম মাস। উৎসবের আগে মাড়াই করা ধান থেকে ঢেঁকিতে বারা ভেনে করা হতো চাল। অনুষ্ঠানের দিন ভোর রাতে ভিজিয়ে রাখা হতো এই চাল। সকালে শুরু হয়ে যেত ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে গুঁড়ি তৈরির কাজ। বড়ো একটি গামলায় মিহি গুঁড়ার মধ্যে ঢেলে দেওয়া হতো ডাবের পানি অথবা খাবার পানি। পানির মধ্যে দেওয়া হতো কুচানো আদা, লবণ, দুধ অথবা নারকেল আর তালের ফোকলা। দেওয়া হতো মুড়ি অথবা খই। মিষ্টি জাতীয় কিছু থাকত সংমিশ্রণে। হাত চুবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বারবার মর্দন করে গুলিয়ে ফেলা হতো পুরো সামগ্রী। একপর্যায়ে দেখা যেত মর্দিত দ্রব্যে ফুটে উঠেছে ফুটকি। অনেকটা শরবতের মতো হলেও এর গাঢ়ত্ব শরবতের চেয়ে অনেক ঘন, আটা বা ময়দার খামিরের মতো। এই সৃষ্ট খাবার দ্রব্যটিকেই নবান্নের মূল খাবার বলা হতো, যার নাম মলিদা। পরিবার ও বাড়ির সবাই এবং আমন্ত্রিতদের মধ্যে সকাল নয়টা-দশটা থেকে বারোটা-একটা অথবা দুপুর পর্যন্ত পরিবেশন করা হতো এই খাদ্য। নবান্ন উৎসবে আবার কেউ কেউ তৈরি করত নাড়ু বা পায়েস।

কোনো কোনো বাড়িতে হতো হাডুডু খেলা, বানর নাচ বা গানবাজনা। আমাদের বাড়িতে ফুফুদের সহায়তায় নবান্নের যাবতীয় কাজ করতেন মা। সবাই দলবেঁধে পুকুরে ভেলা বা নৌকা ভাসিয়ে চেষ্টা করত খাপলা জাল দিয়ে বড়ো কোনো আঁশযুক্ত মাছ ধরবার। ছোটোরা পুকুরজুড়ে সাঁতার কাটত আর পানি ছিটাতো। বাবা চেষ্টা করতেন কোড়াল মাছ জোগাড় করার; কোড়াল মানে সব মোটা মোটা আঁশ। নতুন চালের ভাত আর মাছের বাইরে থাকত অন্যান্য সালুন, তরকারি বা ভর্তা। কাকপক্ষীদেরও ছড়িয়ে দেওয়া হতো খানিকটা খাবার। আমাদের বাড়িতে এই অনুষ্ঠানসহ পড়ানো হতো মিলাদ বা দোয়াদরুদ। আমাদের পুরোনো বাড়ির দাদা মৌলবি মেছের আলী হাওলাদার সচরাচর পড়াতেন এই মিলাদ। ধর্মীয় মন্ত্রতন্ত্র ছাড়া হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উৎসবের বড়ো একটা পার্থক্য ছিল না।

অগ্রহায়ণ, হেমন্ত এবং নবান্ন নিয়ে বাংলার কবিদের মধ্যেও আগ্রহের শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৈবদ্যের স্তব্ধতা কবিতায় লিখেছেন– 'আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে/জনশূন্য ক্ষেত্র মাঝে দিপ্ত দ্বিপ্রহরে/ শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার/রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্ত প্রসার/স্বর্ণ শ্যাম ডানা মেলি'। কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অঘ্রানের সওগাত কবিতায় লিখেছেন– 'ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরণীর সওগাত?/নবীন ধানের আঘ্রানে আজি অঘ্রান হল মাৎ/'গিন্নি- পাগল' চালের ফিরনী/তশতরী ভরে নবীনা গিন্নী/হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশিতে কাঁপিছে হাত/শিরনী রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ি গন্ধে তেলেসমাত'। কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় লিখেছেন– 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে-এই বাংলায়/মানুষ নয়– হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে/হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে/কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়'। কবির কবিতার লাইনের মতোই যেন নবান্নে চিরায়ত বাংলার রূপ। যন্ত্রসভ্যতার যুগে বাঙালির নবান্ন উৎসব খানিকটা ম্রিয়মান। ঢেঁকি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। গ্রামের মেয়েদের এখন আর দলবেঁধে ঢেঁকিতে পা রেখে সুর তুলে ধান ভানতে বা গাইতে শোনা যায় না– 'কৈতরি কৈতরি বারা বান/ বানছি বারা ওদা ধান/খুদ খাইলে খোরা আন/খোরা নিছে স্রোতে/কৈতরি এখন কোঁতে'। আগেকার সেই আমন ধানের পরিবর্তে মানুষ এখন উচ্চফলনশীল দুই/ তিন ফসলি ইরি-বোরো ধান চাষে অধিক মনোযোগী। তবে আশার কথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে বেশ কয়েক বছর ধরে পহেলা অগ্রহায়ণের দিন নবান্ন উৎসব পালিত হয়ে আসছে জাতীয় নবান্ন উৎসব উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে। ❑

গল্পকার

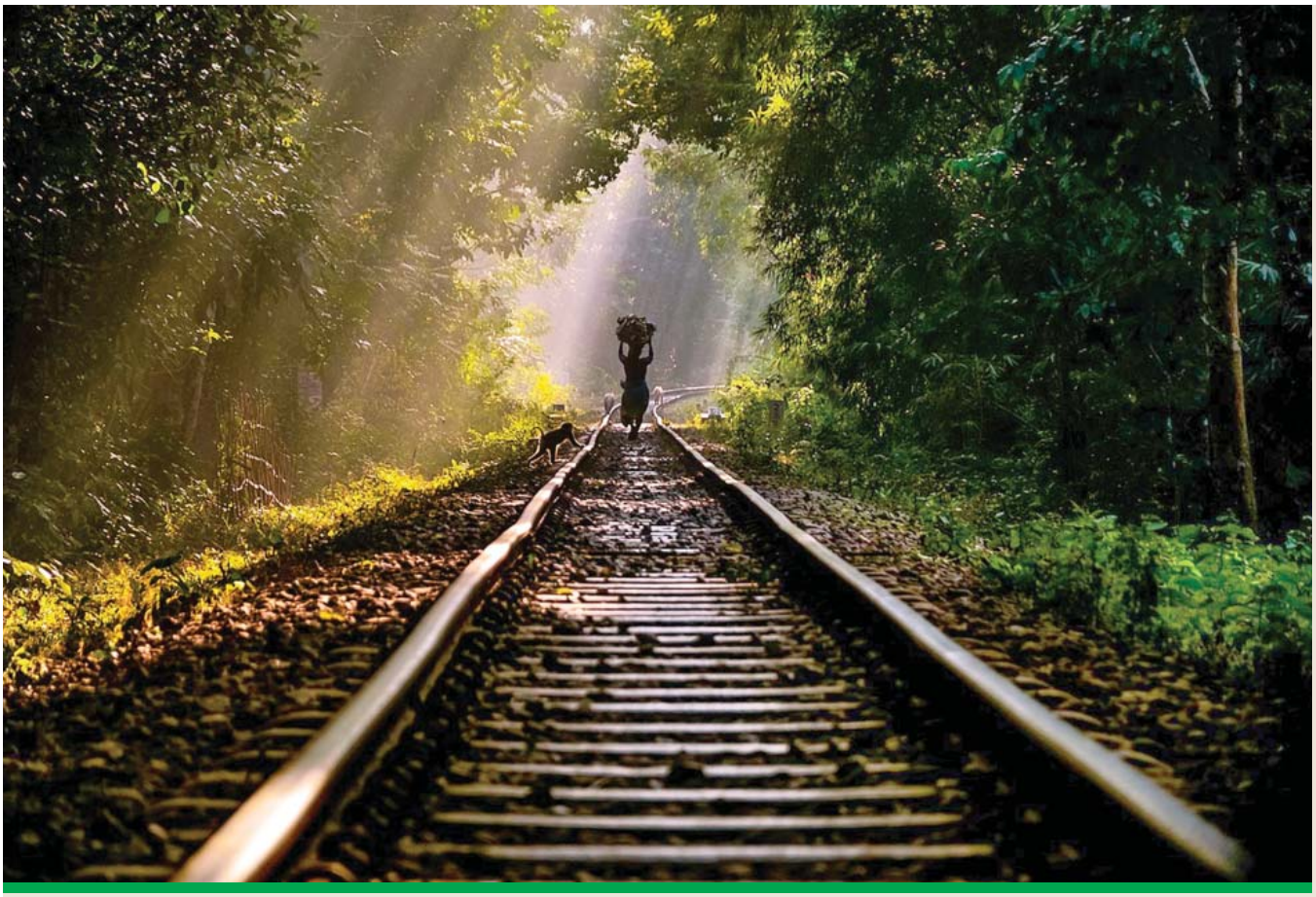

আটষট্টি বছর পর আবার লাউয়াছড়ায়

স. ম. গোলাম কিবরিয়া

গাড়ি থেকে নেমে সস্ত্রীক হাঁটছি। সদলবলে প্রবেশ করলাম লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে। প্রবেশ ফটকের স্থাপত্য নকশা বিশাল পাইথন। বিশাল বিশাল বৃক্ষের মাঝ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রশস্ত পাকা সড়ক। বিদেশিদের জন্য গাড়িসহ প্রবেশের নিয়ম আছে। তবে দেশিদের বেলায় হেঁটেই ঘুরতে হবে। দুপুর চলে গেছে বেশ আগেই। আমাদের হাতে সময়ও কম। সবাই বেশ দ্রুতই হাঁটছে। বিকেল পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যাবে। তবে টিকিট কাউন্টার থেকে বলা হয়েছে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ভেতরে থাকতে পারব। বিশাল বিশাল বৃক্ষ পুরো এলাকা জুড়ে। তাই এখনই আলো কমে গেছে। দিনের শেষ কর্মসূচি। তারপর ঢাকা রওনা হবো। পাশেই স্ত্রী হাঁটছে।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই মনে হলো চোখের মধ্যে একটা আলোকচ্ছটা খেলে গেল। মাথাটাও ঝিম মেরে উঠল। কোথাও যেন চলে গেলাম। হঠাৎই কানে ভেসে এল নারী কণ্ঠ। আরে এ তো শার্লি ম্যাকলাইনের (Shirley MacLaine) কণ্ঠ!

- শার্লি তুমি!

- ক্যান্টিনফ্লেশ (Cantinflas), কী হয়েছে তোমার?

- শার্লি, তুমি জায়গাটা কি চিনতে পেরেছ?

- অনেক বদলে গেছে, তবুও চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না। সেই প্রায় ৭৫ বছর আগের কথা! শার্লি জবাব দিলো।

- তখন কিন্তু এমন পাকা রাস্তা ছিল না। এতটা পরিচ্ছন্নও ছিল না। আর বনটা আরো গহীন ছিল।

- ক্যান্টিনফ্লেশ, হাতিটার কথা মনে আছে তোমার? শ্যুটিংয়ের সময় ট্রেনের পাশ দিয়ে কেমন স্বাচ্ছন্দ্যে হেঁটে চলছিল। আমি ট্রেনের জানালা দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম ওর দিকে!

- দেখো, চা বাগানগুলো কি সুন্দর লাগছে। তখন কিন্তু বাগানগুলো এতটা সাজানো-গোছানো ছিল না। তোমার কি মনে আছে, দূরে দূরে বাড়ি আর ঘরগুলো একটু উচুঁতে তৈরি করা ছিল?

- হ্যাঁ, শুনেছিলাম বন্যপ্রাণী থেকে রক্ষা পেতে ঘরগুলো উঁচু করে করা হতো। এলাকাটা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, শার্লি জবাব দিলো।

- মনে আছে তোমার, কী কষ্টই না হয়েছিল এখানে আসতে। আমার তো ভীষণ রাগ হয়েছিল ব্যাটা এন্ডারসনের প্রতি। মনে মনে বলছিলাম, দুনিয়ায় আর কোনো জায়গা পেলো না! পরে তো জায়গাটার প্রেমেই পড়ে গেলাম।

- শার্লি বলল, সে কি আজকের কথা, সেই ১৯৫৫ সাল! তোমার মতোই আমিও জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেলাম, সেই সাথে তোমারও।

- তখন কি আমরা জানতাম, এত সুন্দর একটা দেশ আছে পৃথিবীতে! আর সেই দেশের গহীন অরণ্যে আমাদের শ্যুটিং করতে হবে। তখন তো বনটা আরো গহীন ছিল।

- তুমি তো এ ছবিতে অভিনয় করতে রাজিই হচ্ছিলে না, শার্লি বলল।

- তোমার দেখি সেই ঘটনাও মনে আছে। তখন আমার খুব বিজি সিডিউল চলছিল। তুমি আর এন্ডারসন (Michael Anderson) আমার বাসায় এসে হাজির হলে। আমি তো এর আগে ওর ছবিতে অভিনয় করিনি। পরিচালক হিসেবে কতটা কোঅপারেটিভ জানা ছিল না। তার ওপর আমি কিছুক্ষণ আগে শ্যুটিং থেকে ফিরেছি। একটু বিরক্তির ভেতর ছিলাম।

- এন্ডারসন আমাকে ফোন করে বলল, শার্লি, রেডি থেকো। তোমাকে নিয়ে একজনের বাসায় যাবো। পরে তো দেখি সোজা তোমার বাসা। সে বলল, তোমার সাথে নাকি ফোনে তার কথা হয়েছিল।

- তুমি সেদিন ওভাবে না বললে আমার হয়ত এই ছবিতে অভিনয় করাই হতো না, আর তোমাকেও পেতাম না।

- সেদিনের সবকিছু আমার মনে আছে ক্যান্টিনফ্লেশ। ছবির নাম শুনেই তুমি জানতে চাইলে জুলভার্নের (Jules Verne) Around the world in 80 days

Around the world in 80 days সিনেমার একটি দৃশ্য, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, শ্রীমঙ্গল

উপন্যাসের কাহিনি কি না? এন্ডারসন হ্যাঁ বলায় তুমি বললে, উপন্যাসটি লেখা হয়েছে ১৮৭৩ সালে। এর চিত্রায়ণ করতে তো বিপুল টাকার প্রয়োজন। এন্ডারসন তোমাকে বলল, টোড (Michael Todd) ছবিটি প্রযোজনা করবে।

- তোমার দেখি সব কথাই মনে আছে। শার্লি, তোমার কী মনে আছে, ছবির বাজেট কত ছিল? আর ছবিটা কেমন ব্যাবসা করেছিল?

- হ্যাঁ, শুনেছি বাজেট ছিল ছয় মিলিয়ন ডলার। তখনকার হিসেবে অনেক বড়ো বাজেট কিন্তু। আর ব্যাবসার কথা কেন বলছ। বড়ো কথা হলো শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে ছবিটা অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। ব্যবসাও কম করেনি। বক্স অফিস হিট। শুনেছি ৪২ মিলিয়ন ডলার ব্যাবসা করেছিল।

- শার্লি, ছবিটা প্রথমে লসএঞ্জেলসে মুক্তি দিতে পারেনি। যতটুকু মনে পড়ে ১৯৫৬ সালের ১৭ই অক্টোবর মুক্তি পেল নিউইয়র্কে, দুইমাস পর ২২শে ডিসেম্বর লসএঞ্জেলসে মুক্তি পেল।

- এই দেখো, এখানে সাইনবোর্ডে লিখেছে টোড নাকি এ ছবির পরিচালক! এরা একটু জেনেশুনে লিখবে না!

- এই ছবিতে ডেভিড নিভেন (David Niven) আর রবার্ট নিউটনের (Robert Newton) কথা তোমার মনে আছে? ওরাও কিন্তু দারুণ অভিনয় করেছিল। ওদের সাথে কি আর তোমার যোগাযোগ আছে, শার্লি?

- না, একেবারেই না। কোথায় যে হারিয়ে গেল! শুধু তুমি আর আমি রয়ে গেলাম একসাথে।

- শার্লি, শ্যুটিংয়ের সময় ঠিক এই জায়গায় তুমি আর আমি একটা ছবি তুলেছিলাম। রেল লাইনের এক স্লিপারে তুমি আর অপরটিতে আমি দাঁড়িয়েছিলাম!

- ক্যান্টিনফ্লেশ, চলো না আজ আরেকটা ছবি তুলি, একই জায়গায়, একই কায়দায়?

এমন সময় মনে হলো কেউ সজোরে ধাক্কা দিলো। তাকিয়ে দেখি আমার সহকর্মী। তার দিকে তাকাতেই বলল, স্যার, আপনি আর ভাবি কী সব বলছিলেন! আমরা তো একটু চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আমাদের এখন বের হয়ে যেতে হবে। আস্তে করে স্ত্রীর কানের কাছে গিয়ে বললাম, তুমিই কি এতক্ষণ আমার সাথে কথা বলছিলে? স্ত্রী বলল, আমার শরীরটা কেমন যেন লাগছে, চলো আগে গাড়িতে গিয়ে বসি।

সময় ফুরিয়ে গেছে। পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যে উঁকি মারছে। টিকিট কাউন্টার থেকে পূর্বে বলে দেওয়া সময়ের মধ্যেই বেরিয়ে এলাম। যাত্রা শুরু হলো ঢাকার পথে। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে রয়ে গেল ক্যান্টিনফ্লেশ আর শার্লি। ❑

[সিনেমার তথ্য সঠিক, বাকি সব কাল্পনিক! চাপা বলতেও বারণ নেই! ১৫ই অক্টোবর ২০২৩]

মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা

গল্প

পাখির ডিম

অমিত কুমার কুণ্ডু

কার্তিক মাস। বাতাসে হালকা শীতের আমেজ। কেবল সকাল হয়েছে। এখনো সূর্য ওঠেনি। কুদ্দুসের মা গোয়াল থেকে গরু-বাছুর খুলে এনে উঠানের একপাশে বাঁধলেন। গরু-বাছুরের মুখের সামনে কিছু খড়বিচুলি এনে দিলেন। গরু-বাছুর সেগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগল। এ বাড়ির উঠানটি বেশ বড়ো। উঠানের এক কোণে দেবকাঞ্চন ফুটে রয়েছে। শিশির ভেজা ঘাসের বুকে

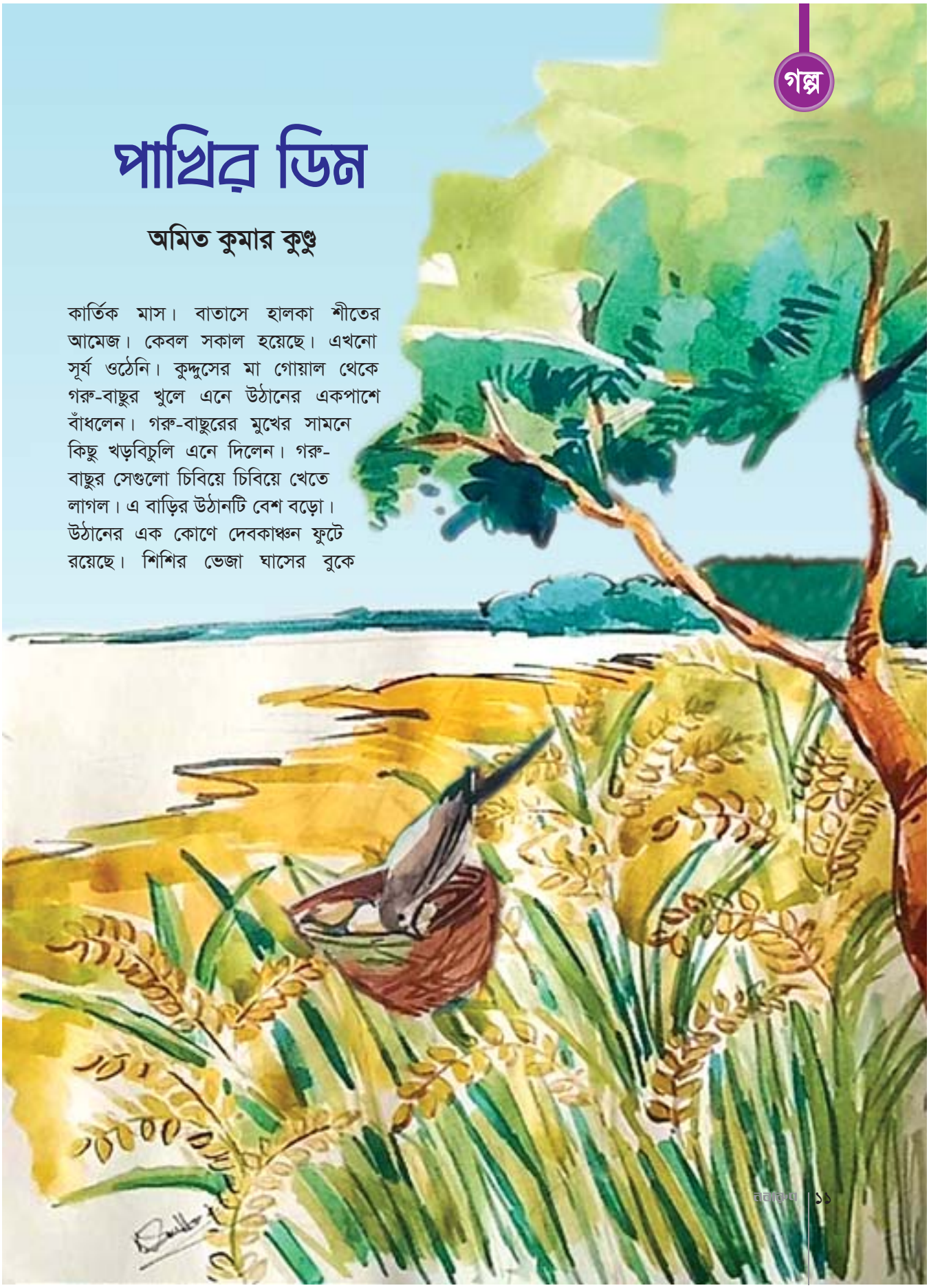

শিউলি ফুল সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে। একটু দূরে মাঠের ধারে বকুল, কামিনি গাছ। বকুল তলায় বকুল আর কামিনি তলায় কামিনি ঝরে পড়ে আছে। বাতাবি লেবুর গাছে থোকায় থোকায় পাকা লেবু দুলছে। মাঠে মাঠে পাকা ধানের সৌরভ। সকালের বাতাস মাঠ থেকে সেই সৌরভ বয়ে আনছে বাড়ির উঠান পর্যন্ত। এই ধান ঘরে উঠলে শুরু হবে নবান্ন উৎসব। বাড়ি বাড়ি আয়োজন হবে পিঠা-পুলির। গরুর দুধ আর খেজুর রসে ভেজা সেসব পিঠার গন্ধে মৌ মৌ করবে বাড়ির পর বাড়ি। গ্রামের পর গ্রাম।

নবান্নের সব আয়োজন বন্ধ হবে যদি ধান কাটা না হয়। ধান মাড়া না হয়। আকাশে একটু একটু মেঘ জমছে। বৃষ্টি হতে পারে। আকাশের দিকে তাকিয়ে কুদ্দুসের মা'র বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। হাতের কাজ ফেলে দ্রুত কুদ্দুসের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকতে থাকলেন, 'এ কুদ্দুস, কুদ্দুস, ওঠ বাপ, এখনো ঘুমিয়ে থাকলে হবে? তোর বাপ সেই রাত থাকতি উঠে অজু করে, ফজরের নামাজ পড়ে, চারটে পান্তা খেয়ে মাঠে চলে গেল। তুই এখনো ঘুমিয়ে থাকলি? ওঠ বাপ?'

'কী হলো আম্মা, এত ডাকছ কেন? কেবল তো সকাল ছয়টা বাজে।'

'ডাকছি কী সাধে বাপ? অকাশের দিকে একবার চেয়ে দেখ। বৃষ্টি আসলি মাঠের ধান যে মাঠেই পড়ে থাকবে।'

কুদ্দুস আম্মার ডাকে ঘুম থেকে উঠে, চোখ-মুখ ধুয়ে, চারটে পান্তা খেয়ে ধান কাটা কাঁচি নিয়ে মাঠে চলে গেল।

আব্বা ধান কাটছে। কুদ্দুসকে দেখতে পেয়ে বলল, 'বাপ, আমি উত্তর দিক থেকে কাটছি। তুই দক্ষিণ দিক থেকে কাট। মধ্যিখানে একটা টেকের মতো আছে। বৃষ্টি হলিও পানি বাদবেনি না।'

কুদ্দুস বলল, 'ঠিক আছে আব্বা। আমি দক্ষিণ দিক থেকেই কাটছি।'

কৃষকরা সাধারণত অনেকে মিলে আড়াআড়ি বসে একপাশ থেকে ধান কাটা শুরু করে। বৃষ্টির ভয়ে বাপবেটা সে নিয়ম পালটে নিল।

আকাশে মেঘ। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। সে বৃষ্টি গায়ে লাগার আগেই বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে কাটতে কাটতে অনেকটা ধান কাটা হয়ে

গেছে। এখন সকাল দশটা। এ বেলাটা বৃষ্টি বিরাম দিলে প্রায় সব ধান কাটা হয়ে যাবে।

জোহরের আজান হলে কুদ্দুসের বাপ ধানক্ষেত থেকে উঠে এল। নামাজ পড়বে। ক্ষেতের পাশের পুকুর থেকে অজু করে নিল। ডাঙার উপর মাটিতে একটা পরিষ্কার গামছা বিছিয়ে নিল। পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করল।

কুদ্দুস তখনো ধান কাটছে। আব্বার নামাজ পড়া সবে মাত্র শেষ হয়েছে। হঠাৎ কুদ্দুস চেঁচিয়ে উঠে, 'আব্বা দেখে যাও। কী কাণ্ড!'

আব্বার বয়স হয়েছে। সে ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি গামছা তুলে কোমরে বেঁধে ছুটতে ছুটতে খেতে নেমে এল। কুদ্দুসের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে, 'কী হয়েছে বাপ? ওমন করে ডাকলি কেন?'

কুদ্দুসের চোখেমুখে হাসি। সে আঙুল দিয়ে টেকের মতো একটা উঁচু জায়গা দেখালো। আব্বাও অবাক। মুখ ফুটে বলল, 'এরাম তো দেখা যায় না আব্বা। অই ধানগুলো তোর কাটার দরকার নেই। কাটলে ডিমগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ আব্বা। আমারও সেরাম মনে হচ্ছিল।'

বিকাল নাগাদ কুদ্দুসদের সব ধান কাটা হয়ে গেল। শুধু ধানক্ষেতের যে উঁচু জায়গায় পাখি কিছু ধান গাছ দিয়ে বাসা বানিয়ে ছয়টা ডিম পেড়েছে, সেই জায়গার ধান কাটা হলো না। অনাগত পাখির ছানাদের নিরাপদ ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাপ-ছেলে কিছু পাকাধান মাঠেই রেখে চলে এল। ❑

গল্পকার

সোনার চেয়ে খাঁটি

শাহ আলম বিল্লাল

গাঁয়ের আলো বাতাস পেয়ে
বড়ো হয়ে উঠি
লেখাপড়া করে চল
গোলাপ হয়ে ফুটি।

বাঁকা নদীর তীরটি যেন
উঠোন জুড়ে হাসি
গাঁয়ের মেঠো পথকে সবাই
অনেক ভালোবাসি।

হাসনাহেনার ঘ্রাণে নিশি
মগ্ন করে রাখে
জোৎস্না মাখা রূপালি চাঁদ
ফিরে ফিরে ডাকে।

সোনালি স্বপ্নের দিন

ডালিয়া ইয়াসমিন

হেমন্ত মানেই সোনালি ফসল। গোলা ভরা ধান। নতুন আমন ধানের মৌ মৌ গন্ধ। পিঠা-পুলি খাওয়ার ধুম। রাতভর যাত্রা-পালা, জারি-সারি গানের উৎসব। ঢেঁকির ছন্দে হেমন্তের গান। কৃষান-কৃষানিদের মেতে ওঠা নবান্নের উৎসবের আমেজ। বাংলার কবি- সাহিত্যিক তাই হেমন্তকে নানা রঙে বর্ণনা করেছেন–

ধান পেকেছে মাঠে মাঠে
চাষার মুখে হাসি,
হলুদরঙা ওই ফসলে
স্বপ্ন রাশি রাশি!
নতুন ধানে ভরবে গোলা
নেই কৃষানের ঘুম,
নতুন ধানে নতুন চালে
নবান্নেরই ধুম!

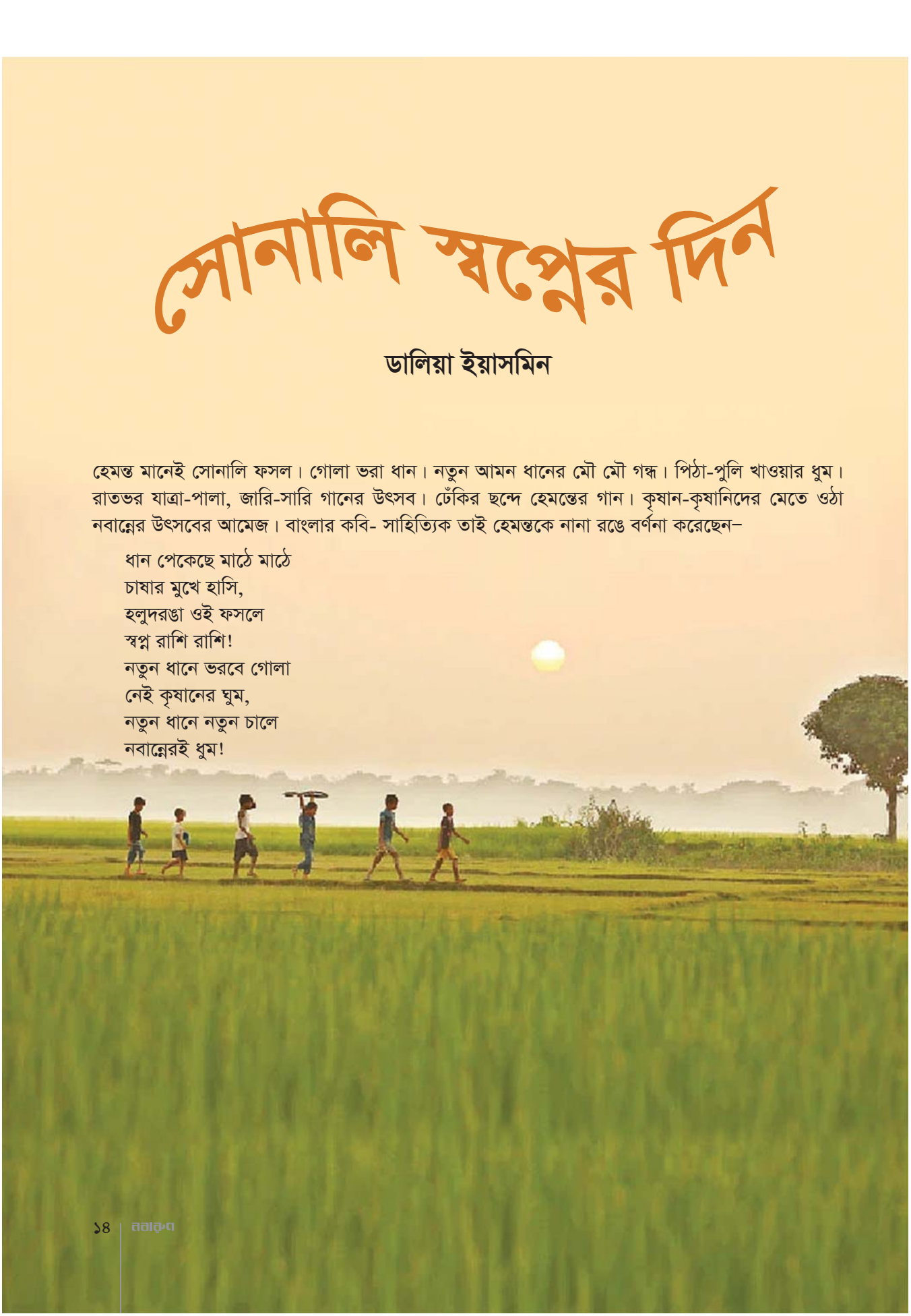

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন ও জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কৃষক ভাইয়েরা জমিতে ফসল ফলান। ধীরে ধীরে সবুজ ধানের ক্ষেত সোনালি রং ধারণ করে। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস হলো ধান পাকার উপযুক্ত সময়। এ সময় দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে পাকা ধানের সোনালি আভা। এ আভা শুধু মাঠে নয় ছড়িয়ে যায় কৃষকের মুখে, তাদের আনন্দ ও হাসিতে। কবি জসীম উদ্দীনের ভাষায়–

আশ্বিন গেল, কার্তিক মাসে পাকিল ক্ষেতের ধান,
সারা মাঠ ভরি গাহিতেছে কে যেন হলদি কোটার গান।
ধানে ধান লাগি বাজিছে বাজনা, গন্ধ উড়িছে বায়,
কলমীলতায় দোলন লেগেছে, হেসে কূল নাহি পায় ।
আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
মাঝে মাঠখানি চাদর বিছায়ে হলুদ বরণ ধানে।

['সুখের বাসর' নকশী কাঁথার মাঠ]

আমাদের লোক সংস্কৃতির অন্যতম উৎসব হলো নবান্ন উৎসব। নবান্ন শব্দের অর্থ হলো নতুন অন্ন। কৃষকের মুখে ধান কাটার গান আমাদের মনে করিয়ে দেয় নবান্ন উৎসবের কথা।

হেমন্তকালে নতুন আমন ধানের গন্ধে চারদিক মুখরিত হয়। চলে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের কাজ। নতুন আমন ধান থেকে তৈরি হয় চাল, সেই চাল গুঁড়ো করে তৈরি করা হয় পিঠা-পুলি, পায়েস। এছাড়া মুড়ি, মোয়া, চিড়া এবং নাড়ুও তৈরি করা হয়। পাড়া-প্রতিবেশিরা মেতে ওঠে পিঠা-পুলি তৈরির উৎসবে। ধান ভানার গান ভেসে বেড়ায় বাতাসে, ঢেঁকির তালে মুখরিত হয় বাড়ির আঙিনা। নবান্ন আর পিঠে-পুলির আনন্দে মাতোয়ারা হয় সবাই।

নতুন ধানে নতুন চালে
নতুন ভাতের হাসি,
আমন ধান কাটতে ব্যস্ত
বাংলার সকল চাষি।
ধান মাড়াতে ব্যস্ত গাঁয়ের
কৃষান-কৃষানির দল,
হেমন্তের জোছনা মাখা রাত
আনন্দ কোলাহল!
কৃষানি রান্নার ফাঁকে
কুলাতে ঝাড়ে ধান,
ধাপুর ধুপুর ঢেঁকি নাচে
গেয়ে হেমন্ত গান।

নবান্ন উপলক্ষে অনেক গ্রামে মেলার আয়োজন করা হয়। মেলাতে পাওয়া যায় মণ্ডা-মিঠাই, খেলনা, মাটির পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈরি নানা জিনিস। এছাড়া পাড়ায়

পাড়ায় আয়োজন করা হয় যাত্রা, কীর্তন , পালাগান ও জারিগানের আসর। বর্তমানে শহরেও নবান্ন উৎসবের আয়োজন করা হয়। দেশীয় পিঠার সমাহার, খেলনা, বাঁশ ও বেতের তৈরি নানারকম জিনিস থাকে, সাথে নাচ-গানের আসর বসে নবান্নের এই মেলায়।

প্রকৃতির নিয়মেই হেমন্ত নিয়ে আসে হিম হিম মৃদু কুয়াশা। সঙ্গে শীতের আগমনি বার্তা। আবহমানকাল থেকেই হেমন্ত মানেই কৃষকের মুখে অনাবিল হাসি। ঋতুকন্যা হৈমন্তীর প্রেমে হাবুডুবু খায় পুরো প্রকৃতি। তাই হেমন্তকে বলা হয় ঋতুকন্যা।

উষ্ণ শীতল হাওয়ার সাথে
হেমন্ত আসে ঘরে, আবছা শীতল কুয়াশা নামে
এই ধরণির পরে।

রবীন্দ্রনাথের লেখায় সব ঋতুই ঠাঁই পেয়েছে কমবেশি, তবে সবচেয়ে কম লিখেছেন হেমন্ত ঋতু নিয়ে। তবু হেমন্তকে 'লক্ষ্মী' উপাধি দিয়েছেন তিনি । হেমন্তের ফসল ভরা ক্ষেতে দেশমাতৃকার হাসি দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমাদের জাতীয় সংগীতে তারই আভাস মেলে, 'ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,/ (আমি) কি দেখেছি মধুর হাসি-'

হেমন্ত আপামর খেটে খাওয়া মানুষের সংস্কৃতি। সে সংস্কৃতি ও আবেগকে কাব্যিক স্বীকৃতি দিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ। কবি জীবনানন্দের ভাষায়–

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে-
এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল
শালিকের বেশে
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের
নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ
কাঁঠাল-ছায়ায়; ❑

সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ, ডিএফপি

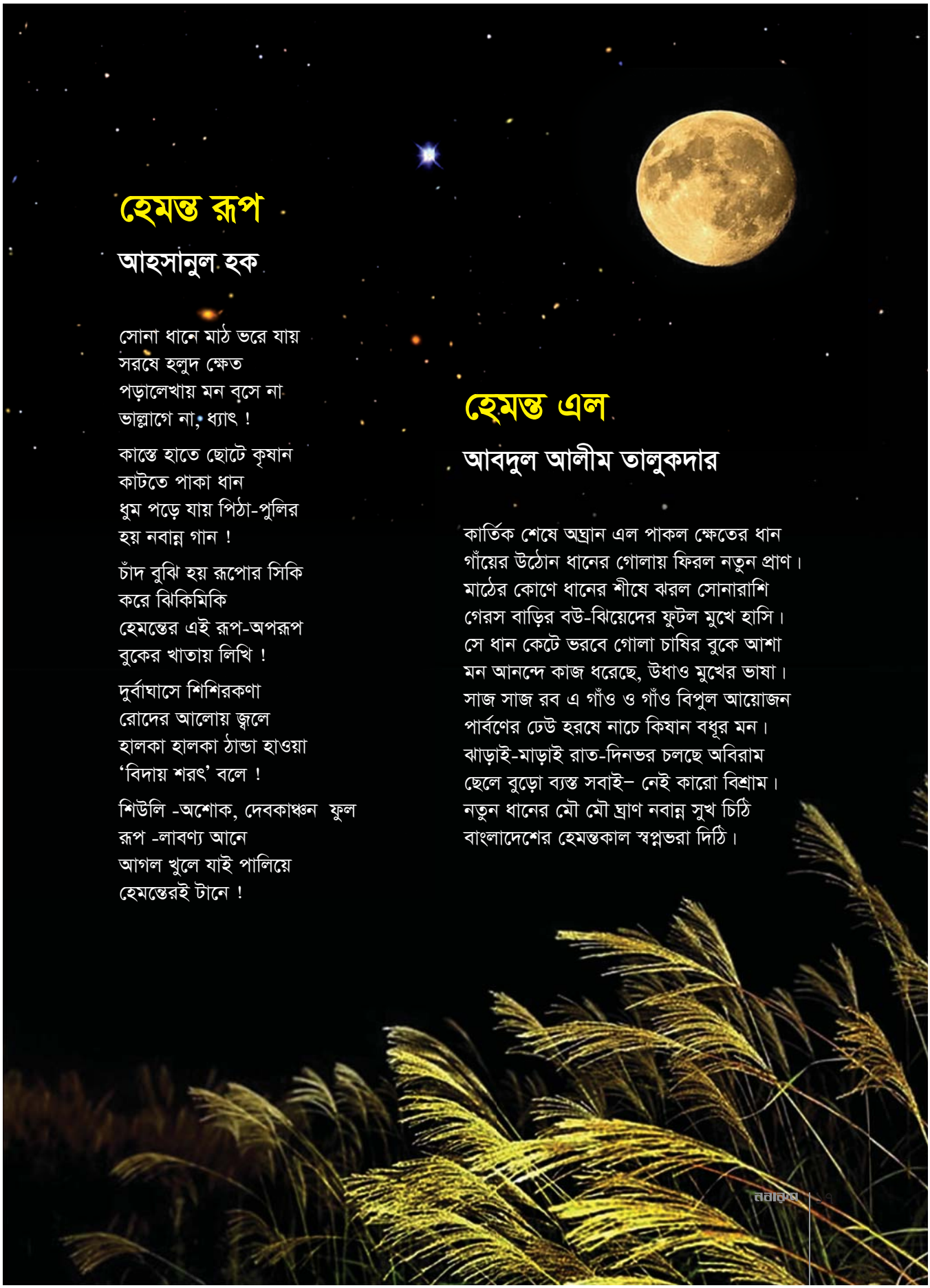

হেমন্ত রূপ

আহসানুল হক

সোনা ধানে মাঠ ভরে যায়
সরষে হলুদ ক্ষেত
পড়ালেখায় মন বসে না
ভাল্লাগে না, ধ্যাৎ !

কাস্তে হাতে ছোটে কৃষান
কাটতে পাকা ধান
ধুম পড়ে যায় পিঠা-পুলির
হয় নবান্ন গান !

চাঁদ বুঝি হয় রূপোর সিকি
করে ঝিকিমিকি
হেমন্তের এই রূপ-অপরূপ
বুকের খাতায় লিখি !

দুর্বাঘাসে শিশিরকণা
রোদের আলোয় জ্বলে
হালকা হালকা ঠান্ডা হাওয়া
'বিদায় শরৎ' বলে !

শিউলি -অশোক, দেবকাঞ্চন ফুল
রূপ -লাবণ্য আনে
আগল খুলে যাই পালিয়ে
হেমন্তেরই টানে !

হেমন্ত এল

আবদুল আলীম তালুকদার

কার্তিক শেষে অঘ্রান এল পাকল ক্ষেতের ধান
গাঁয়ের উঠোন ধানের গোলায় ফিরল নতুন প্রাণ।
মাঠের কোণে ধানের শীষে ঝরল সোনারাশি
গেরস বাড়ির বউ-ঝিয়েদের ফুটল মুখে হাসি।
সে ধান কেটে ভরবে গোলা চাষির বুকে আশা
মন আনন্দে কাজ ধরেছে, উধাও মুখের ভাষা।
সাজ সাজ রব এ গাঁও ও গাঁও বিপুল আয়োজন
পার্বণের ঢেউ হরষে নাচে কিষান বধূর মন।
ঝাড়াই-মাড়াই রাত-দিনভর চলছে অবিরাম
ছেলে বুড়ো ব্যস্ত সবাই– নেই কারো বিশ্রাম।
নতুন ধানের মৌ মৌ ঘ্রাণ নবান্ন সুখ চিঠি
বাংলাদেশের হেমন্তকাল স্বপ্নভরা দিঠি।

হেমোন্তিকা

মুহাম্মদ ইসমাঈল

ঋতুর রানি হেমোন্তিকা
বার বার আসে
কৃষানিরা পিঠা বানায়
আনন্দেতে ভাসে।

ধান ভাঙে চিড়া দই
শীতের আমেজটা কই
হাসিমুখে প্রাতকালে
নাশতাটা খই।

গ্রামের মেঠোপথে
চলি যখন একলা
খোকা-খুকুরা এসে তখন
পথে বাধে জটলা।
এভাবে হেমন্ত বার বার আসুক
খোকা-খুকুরা আনন্দে ভাসুক।

হেমন্ত আসে

নুসরাত জাহান

পাকা ধানের হাসি নিয়ে
ঋতুরানি হেমন্ত আসে।
শিউলি, ছাতিম, গন্ধরাজ
হেমন্ত দিনে সাজে।

প্রকৃতি যেন হাসে
এক অজানা আনন্দে
গ্রাম বাংলার মানুষ
উৎসবে যায় মেতে।

ধান মাড়াতে ব্যস্ত গাঁয়ের
কৃষান-কৃষানির দল
হেমন্তের জোছনা মাখা রাত
আনন্দ কোলাহল!

নতুন ধানে ভরবে গোলা
নেই কৃষকের ঘুম,
নতুন ধানে নতুন চালে
নবান্নেরই ধুম!

পিঠা-পায়েস-ক্ষীর খেয়ে
খোকা খুকু হাসে
মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালি বাজে
রূপসী নদীর ঘাটে।

গল্প

নবান্ন উৎসবের ভোজে

আহমেদ রিয়াজ

বাসা থেকে বেরোতে বেশ দেরি করে ফেলল ফেচু। এতক্ষণে ওর বাঁশের খুঁটিটা নির্ঘাত অন্য কারোর দখলে চলে গেছে।

ফেচু একটা ফিঙে পাখি। কুচকুচে কালো। লেজটা মাছের লেজের মতো দুভাগ।

বাসা থেকে দেরি করে বেরুলেই ঝামেলা। খুঁটিটা হয়ত আরেকটা ফিঙে দখল করে নিয়েছে। দখল ফিরে পেতে হয়ত ওই আরেকটা ফিঙের সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে। মারপিটও হতে পারে।

পাহাড়ের কোলে ঘন জঙ্গল। ওই জঙ্গল পাড়ি দিয়ে তারপর মাঠে যেতে হয়। পাহাড়ের উপর দিয়ে যেতে পারলে সময় কম লাগত। কিন্তু পাহাড়ের ওপর এক ঝাঁক চিল সবসময় আস্তানা গেড়ে বসে থাকে, নয়ত পাহাড়ের উপর ঘুরে বেড়ায়। ফিঙেদের দেখলেই তেড়ে আসে। একবার তো চিলের তাড়া খেয়ে...

থাক। ওটা আর মনে করতে চায় না ফেচু। তবে সেই থেকে পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলাফেরা করে ও। সময়টা বেশি লাগলেও চিলদের কাছ থেকে দূরে তো থাকা যায়!

ডানা দুটো মেলে দিয়ে দ্রুত পাহাড় পেরোলো ফেচু। পাহাড় পেরোতেই মাঠটা চোখে পড়ল। মাঠের দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠল ফেচু। এ কী!

যে বাঁশের খুঁটিতে ও প্রতিদিন এসে বসত, সেটা নেই। পুরো মাঠে চোখ বোলালো ফেচু। নেই। মাঠে একটাও বাঁশের খুঁটি নেই। অথচ গতকাল বিকেলেও অনেকগুলো বাঁশের খুঁটি ছিল। একেকটা খুঁটিতে বসত একেকটা ফিঙে। কিন্তু খুঁটিগুলো কোথায় গেল?

তখনই খেয়াল করল ফেচু। মাঠে অনেক মানুষ। ধান কাটছে।

মাঠের পাশে একটা ছাতিম গাছ। থোকায় থোকায় সাদা ফুল ফুটে আছে। এক থোকা ফুলের আড়ালে গিয়ে বসল ফেচু। আর মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল।

মাঠ থেকে পাকা ধানের গাছ কাটছে লোকগুলো। তারপর আঁটি বেঁধে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখছে। দেখতে দেখতে সেই স্তূপ বিশাল হয়ে গেল।

বেশ খিদে পেয়েছে ফেচুর। গতকালও ধান গাছ থেকে খুঁজে খুঁজে পোকা খেয়েছে। কত্ত পোকা ছিল! খেয়েও শেষ করতে পারত না। অনেকগুলো ফিঙে সারাদিন এ মাঠে পোকা খুঁজে বেড়াতো। কিন্তু আজ কোনো ফিঙে দেখতে পাচ্ছে না ও। বাকিরা কোথায় গেল?

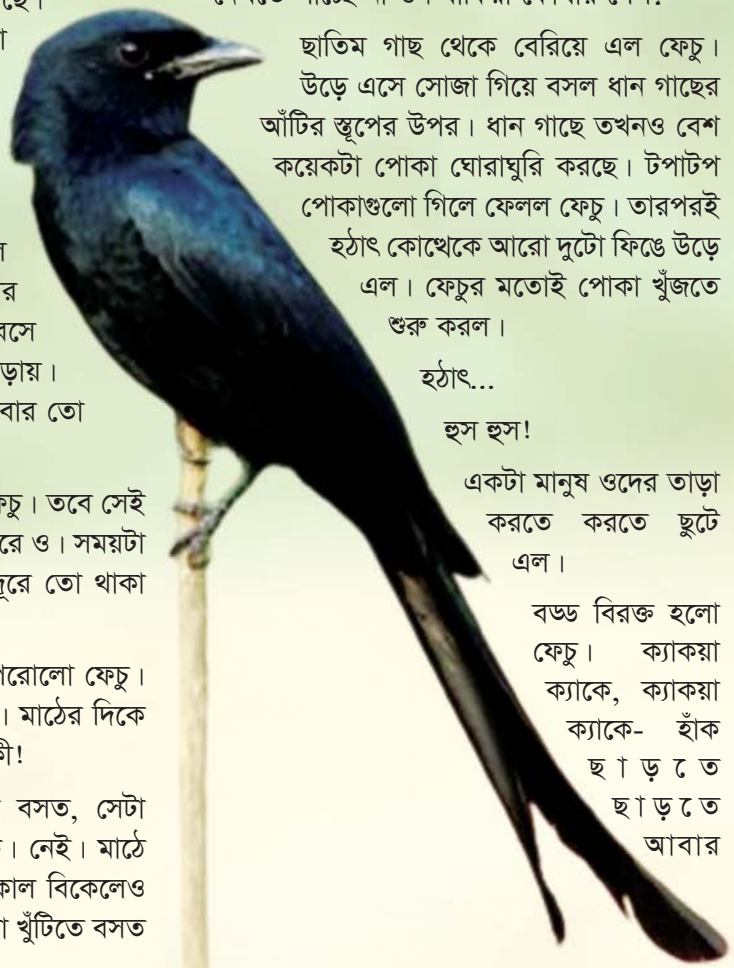

ছাতিম গাছ থেকে বেরিয়ে এল ফেচু। উড়ে এসে সোজা গিয়ে বসল ধান গাছের আঁটির স্তূপের উপর। ধান গাছে তখনও বেশ কয়েকটা পোকা ঘোরাঘুরি করছে। টপাটপ পোকাগুলো গিলে ফেলল ফেচু। তারপরই হঠাৎ কোত্থেকে আরো দুটো ফিঙে উড়ে এল। ফেচুর মতোই পোকা খুঁজতে শুরু করল।

হঠাৎ...

হুস হুস!

একটা মানুষ ওদের তাড়া করতে করতে ছুটে এল।

বড্ড বিরক্ত হলো ফেচু। ক্যাকয়া ক্যাকে, ক্যাকয়া ক্যাকে- হাঁক ছাড়তে ছাড়তে আবার

ছাতিম গাছে গিয়ে বসল ও। ভাগ্যিস পেটে কিছু পড়েছে! ধানের স্তূপে আরো অনেক পোকা দেখেছে। আরো কয়েকটা পোকা জোগাড় করতে পারলে ঘরে নিয়ে যেত।

ধান গাছের স্তূপে উঁকি দিল। নেই। ওকে তাড়া দিতে আসা লোকটা নেই।

কিন্তু এ কী! ধান গাছগুলো নড়তে শুরু করে দিয়েছে। ধান গাছের আঁটিগুলো মানুষের ঘাড়ে চেপে চলে যাচ্ছে। আর একসময় পুরো জায়গাটা খালি হয়ে গেল।

মাঠটা তখন খালি। একটাও ধান গাছ নেই। কেবল ধান গাছের গোড়াগুলো মাটি আঁকড়ে রয়েছে। ধান গাছের আঁটির স্তূপগুলোও নেই। ওই স্তূপের জায়গায় কিছু পাকা ধান পড়ে আছে। ওখানে কি পোকা আছে? থাকতে পারে।

আবার যেই উড়াল দিতে যাবে ফেচু, অমনি হঠাৎ কোত্থেকে ভেসে এল তুমুল শব্দ- ক্যাঁক ক্যাঁক ক্যাঁক।

উফ! কী তীক্ষ্ম আওয়াজ। ফেচুর কানদুটো ঝালাপালা হয়ে গেল। একঝাঁক টিয়ে পাখি উড়ে এসে ধানের স্তূপের খালি জায়গা জুড়ে বসল। আর পড়ে থাকা পাকা ধান খেতে শুরু করল।

অপেক্ষা করতে লাগল ফেচু। টিয়েগুলো চলে গেলেই পোকার খোঁজে বেরুবে।

অনেকক্ষণ পর। ঠিক যেমনি ঝাঁক বেঁধে এসেছিল, তেমনি আবার ঝাঁক বেঁধে চলে গেল টিয়েগুলো। এবার উড়াল দিল ফেচু। ধানের স্তূপের জায়গাটায় কেবল এসেছে, অমনি আবারও হইচইয়ের শব্দ ভেসে এল। কোত্থেকে আসছে শব্দটা? শব্দের দিকে তাকালো ফেচু। আরে! আরেক দল টিয়ে! আগেরটার চেয়েও বড়ো ঝাঁক। নাহ। টিয়েগুলোর জন্য দেখছি কিছুই পাওয়ার উপায় নেই। কোত্থেকে যে খবর পায় টিয়েগুলো?

এবার টিয়েগুলো পুরো মাঠজুড়ে এসে বসল। তারপর হইচই করতে করতে খুঁজে খুঁজে খাবার খেতে শুরু করল।

কয়েকবার হাঁক ছাড়ল ফেচু। কিন্তু টিয়েগুলোর হইচইয়ে সে শব্দ কেউ শুনতেই পেল না। কী আর করা। আবার সেই ছাতিম গাছের ডালে এসে বসল ফেচু। ততক্ষণে ছাতিম ফুলেরাও সুবাস ছড়াতে শুরু করে দিয়েছে। তার মানে বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

নিশ্চয়ই টিয়েগুলো সন্ধ্যের আগেই চলে যাবে। তখন না হয় আবার গিয়ে খাবার খুঁজবে।

আবার অপেক্ষা করতে লাগল ফেচু। অপেক্ষার পালা যে আর ফুরায় না। সন্ধ্যেও হয়ে গেল। এর মধ্যে অনেকগুলো টিয়ে চলেও গেছে। কিছু টিয়ে তখনও মাঠে ওড়াওড়ি করছিল।

নাহ। আজ আর আশা নেই। বাড়ির পথ ধরল ফেচু। আজকের রাতটা খিদে নিয়েই কাটাতে হবে।

পরদিন ভোরবেলা সেই মাঠে এসে হাজির হলো ফেচু। পুরো মাঠ জুড়ে তল্লাশি চালালো। নেই। কোনো পোকা নেই। ধান গাছ নেই তো পোকা থাকবে কী করে? এমনকি একটা ধানও নেই। পুরো মাঠের প্রত্যেকটা ধান সাবাড় করে চলে গেছে টিয়েগুলো।

তবু মাঠের উপর বেশ কয়েকটা চক্কর দিলো ফেচু। দূর থেকে দূরে তাকালো। সবগুলো মাঠ খালি। কোনো মাঠেই ধান গাছ নেই। ফেচু জানে, বছরের এ সময় ধান কাটা হয়। সেই ধান চলে যায় কৃষকের বাড়ি। তারপর সেই ধান থেকে চাল বানায় মানুষ। আর সেই চাল থেকে কত্ত কিছু যে বানায়!

বাড়িতে বাড়িতে এর মধ্যেই উৎসব শুরু হয়ে গেছে। তখনই কিছু একটা মনে পড়ল ফেচুর। আর মনে পড়তেই সাঁই করে উঠে গেল অনেক উঁচুতে। তারপর ডানা মেলে দিলো সোজা উত্তর দিকে। ওদিকেই মানুষের গ্রাম।

গ্রামে ঢুকতেই হইচই। না। টিয়েদের হইচই নয়। দলবেঁধে শিশুরা ছড়া গান গাইছে–

কো কো কো
আমাগো বাড়ি শুভ নবান্ন।
শুভ নবান্ন খাবা
কাকবলি লবা।
পাতি কাউয়া লাঠি খায়
দাড় কাউয়া কলা খায়।
কো কো কো
আমাগো বাড়ি শুভ নবান্ন।

ছড়া গান গাইতে গাইতে শিশুরা একটা গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। তারপর সেই গাছের গোড়ায় রেখে দিলো কলার ডোগা। আর সেই ডোগায় থরে থরে সাজানো... কী?

নতুন চাল, কলা আর নারকেলের নাড়ু।

গাছের ডালে বসে বসে দেখতে লাগল ফেচু। তার মানে গ্রামে নবান্ন উৎসব শুরু হয়ে গেছে। সেই উৎসবের কিছু খাবার শিশুরা রেখেছে পাখিদের জন্য।

আর রেখেই ছড়া গান গাইতে গাইতে চলে গেল শিশুরা।

শিশুরা চলে যেতেই ভোঁ করে গাছ থেকে নেমে এল ফেচু। দেখতে দেখতে আশপাশের গাছ থেকে আরো অনেক পাখি নেমে এল। আর সবপাখি মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল নবান্ন উৎসবের ভোজে। ❑

গল্পকার

গল্প

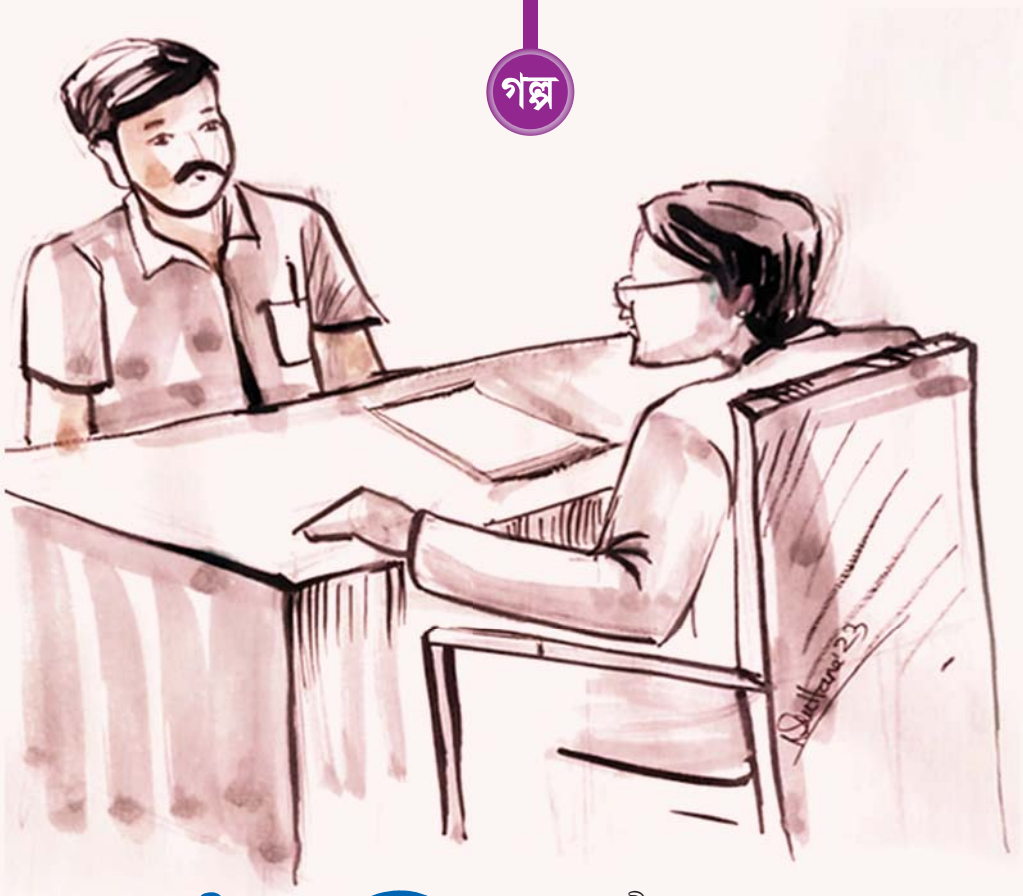

ভুবন মাস্টারের বিনয়

জুয়েল আশরাফ

ভুবন মাস্টার নিরীহ লোক। ক্লাসে নিয়মমতো আসেন। কখনও উচ্চ আওয়াজে কথা বলেন না। বিনা বেত আর ধমকে পড়ান তিনি। কেউ পড়া না পারলে পকেট থেকে দশ টাকার একটি নোট বের করে হাতে দিয়ে বলবেন, 'এক প্যাকেট চিপস কিনে নিস। এখন থেকে মন দিয়ে পড়বি কেমন'? যদি দেখেন কোনো শিক্ষক বেত্রাঘাত করে ছাত্র পড়াচ্ছেন। আড়ালে গিয়ে চোখ মুছেন। একবার তো হেডমাস্টার এক ছাত্রের দুষ্টুমির কারণে এমন মার মারলেন, মারের চোটে ছাত্রের রফাদফা অবস্থা। ভুবন মাস্টার সেই দৃশ্য সইতে পারলেন না। বাথরুমের কল ছেড়ে হেঁচকি তুলে কাঁদলেন অনেকক্ষণ। এমনই সরল-শান্ত।

আজ সকালে বাড়ি থেকে খবর এসেছে- স্ত্রীর অসুখ। ভুবন মাস্টার মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না। স্কুলে থাকাকালীন তাকে কারোর দরকার পড়লে অফিস ঘরে কল করে ডেকে আনেন। ভুবন মাস্টারেরও আজ ডাক পড়েছে। ফোনটি ধরেছিলেন হেডমাস্টার। দপ্তরি গনামকে দিয়ে ডেকে আনলেন অফিস ঘরে। শান্ত ভঙ্গিতে হেডমাস্টারের কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাকে বসতে বললেন। হেডমাস্টার এই লোকটির নিরীহ গল্পগুলো অনেক জানেন। তাই চিন্তার ভেতর পড়ে গেলেন বাড়ির খবরটা কী করে দেবেন। হেডমাস্টার শুরুটা করলেন এভাবে-

আপনার শরীর কেমন আছে?

ভুবন মাস্টার সামান্য নড়েচড়ে বসলেন। সম্ভবত তিনি শরীরের পার্টস পরীক্ষা করলেন। বললেন, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি।

অনেকদিন হলো আপনি ছুটি নেন না। বাড়িও যাচ্ছেন না। আজ ছুটি নিয়ে একবার বাড়ি যান।

ছুটি শব্দটা কানে আসা মাত্র ভুবন মাস্টার যেন আঁতকে উঠলেন। বললেন, না না, এখন ছুটিছাটা লাগবে না আমার। বাচ্চাদের সামনে পরীক্ষা। আমি ছুটি নিলে ওদের পড়াশোনার ক্ষতি।

হেডমাস্টার বললেন, পরীক্ষা নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না। দু-দিন না এলে আপনার ছাত্রদের পড়াশোনা শিকেয় উঠবে না।

ভুবন মাস্টার বিনয়ের সঙ্গে বললেন, তা থাক, আমার এখন ছুটি দরকার নেই। ছুটি লাগলে আমি জানাবো।

হেডমাস্টার মহা বিপদে পড়লেন। এই লোকটিকে যে করেই হোক বাড়িতে পাঠাতে হবে। স্ত্রী হাসপাতালে আর তিনি স্কুলে পড়ে থাকবেন এটা ভালো দেখায় না। কিঞ্চিৎ আদেশের সুরে বললেন, আপনি আজ ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যান। স্ত্রী, সন্তানদের সময় দিন। কতদিন তারা আপনাকে বাড়িতে পাচ্ছে না।

স্যার, বাড়িতে আমার পরিবারের লোকজনের কোনো সমস্যা হবে না। আমার স্ত্রী বড়ো ভালো মানুষ। সে ছেলে-মেয়েদের যত্ন করে পড়ায়। তাদের কিছু দরকার হলে আমি বলে রেখেছি স্কুলে ফোন করবে।

আচ্ছা আপনাকে আমি আসল কথা বলতেই ভুলে গেছি। আপনার বাড়ি থেকে একটু আগে ফোন এসেছে। আপনার স্ত্রীর শরীর ভালো না। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপনি গিয়ে দেখে আসেন একবার।

হেডমাস্টার জানেন এই কথায়ও কাজ হবে না। হলোও তাই। ভুবন মাস্টার একটুও বিচলিত হলেন না। স্ত্রীর অসুখ জেনেও ঘাবড়ে গেলেন না। স্বাভাবিক গলায় বললেন, কী হয়েছে বলেছে কিছু?

না। শুধু জানালো অবস্থা ভালো না। আপনাকে আজই তারা হাসপাতালে দেখতে চায়।

কিন্তু আমি যাব কী করে? আলিফের পা এখনও ঠিক হয়নি।

হেডমাস্টার ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, আলিফটা কে?

সেভেন ক্লাসের ছাত্র। পেয়ারা গাছের ডাল ভেঙে নিচে পড়েছে। পা মচকে গেছে।

হেডমাস্টার সামান্য বিরক্ত হয়ে গেলেন। বললেন, তাতে আপনার সমস্যা কী? ওকে দেখার জন্য ওর বাবা-মা আছে।

এই কথায় ভুবন মাস্টারের যেন পিলে চমকে উঠল। ভীত গলায় বললেন, না স্যার, বাবা-মায়েরা ছেলের দুষ্টুমির কারণে আরও মারধর করতে পারে। তাছাড়া আমি ছেলেটাকে বাড়ি যেতে দেব না এখন। ওর পা ঠিক করে এনেছি প্রায়। জঙ্গল থেকে একটি গাছের পাতা থেতলে রস লাগিয়ে দিয়েছি। ঠিক হলেই সে হাঁটতে পারবে।

হেডমাস্টার আগের থেকে আরও বিরক্ত হয়ে গেলেন। বললেন, আপনার স্ত্রীর অসুখ। তিনি আছেন হাসপাতালে। আর আপনি আছেন স্কুলের ছাত্রের পায়ের চিকিৎসা নিয়ে! আজব মানুষ আপনি।

এমন কথায় ভুবন মাস্টার লজ্জা পেলেন। লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, আসলে স্যার ব্যাপারটা হয়েছে কী, আলিফ গাছে চড়তে চাইছিল না। তাকে জোড় করে উঠানো হয়েছে। আপনার ছোটো মেয়েটি পেয়ারা খাবে বলে ফ্যাত করে কেঁদে ফেলল। মেয়ের কান্না থামাতেই আপনার স্ত্রী একপ্রকার জোর করেই আলিফকে গাছে উঠিয়ে দিলেন। আমি দূর থেকে সব দেখছিলাম। যখন আলিফ গাছ থেকে পড়ে যায় দৌড়ে এসে তাকে ধরে উঠাতেই দেখি ম্যাডাম পেয়ারা আর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গেটের বাইরে চলে গেছেন। এমন অবস্থায় আলিফকে একা ফেলে আমি কোথায় যাই?

হেডমাস্টার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ভুবন মাস্টারের দিকে। মুখে কোনো কথা নেই। ভুবন মাস্টার বিনয়ের সঙ্গে বললেন, স্যার আমাকে অনুমতি দিন। আলিফের পা টা আরেকবার দেখে আসি। ছেলেটাকে লাইব্রেরি ঘরে শুইয়ে রেখেছি। যেই পাতার রস লাগিয়েছি ব্যথা থাকার কথা না। আধ ঘণ্টার ভেতর ব্যথা পইপই করে পালাবে।

ভুবন মাস্টার অনুমতির অপেক্ষা করলেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুত এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। যদি তিনি একবার পেছনে ফিরে তাকাতেন তাহলে দেখতে পেতেন এই স্কুলে শুধু একজনেরই পা মচকে ব্যথার সৃষ্টি হয়নি, হেডমাস্টারের বুকেও আচমকা ব্যথা হয়ে চোখ বেয়ে পানি পড়ছে টপ টপ...। ❑

গল্পকার

বাংলা কবিতায় নবান্ন

কাজী মহম্মদ আশরাফ

বৈশাখ এখন বঙ্গাব্দের প্রথম মাস। কয়েক শতাব্দী আগে এমন ছিল না, ইতিহাস বলে অগ্রহায়ণ ছিল বাংলা সনের প্রথম মাস। কার্তিক ছিল বছরের শেষ মাস। ওই মাসে বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে হাহাকার দেখা দিত, এজন্য তখন কার্তিক মাসকে বলা হতো 'মরা কার্তিক'। এ মাসে ঘরে ঘরে খাদ্যাভাব থাকত, তাই কোনো উৎসব করা হতো না। এজন্য এখনও অনেক গ্রামে কার্তিক মাসে বিয়ে হয় না, নতুন ঘর তোলা হয় না।

কার্তিকের পরেই আসে অগ্রহায়ণ মাস। এ মাসে ফসলের মাঠে ধান কাটার ধুম লেগে যায়। বাড়িতে-বাড়িতে কাটা ধানের স্তূপ। উঠানে উঠানে ধানমাড়াই করা, সিদ্ধ করা এবং শুকানোর কাজ দেখা যায়। নতুন ধান উঠার পর কৃষকের ঘরে ঘরে যে আনন্দের উৎসব দেখা যায়, এটাকেই বলা হয় নবান্ন। এই নবান্ন নিয়ে অনেক গান আছে, কবিতা আছে, নাটক আছে, গল্প আছে, এবং সাহিত্যের নানা শাখার কাজ রয়েছে।

নবান্ন নিয়ে বাংলা সাহিত্যের সেরা নাটকটি রচনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য, তাঁর নাটকের 'নাম ও *নবান্ন*'। দেশ-বিদেশে এ নাটক শত শত বার মঞ্চায়িত হয়েছে, পঠিত হয়েছে এবং এখনও আলোচিত হচ্ছে। নবান্ন নিয়ে সবচেয়ে ভালো কবিতাটি লিখেছেন বিশ শতকের প্রথম দিকের বিখ্যাত কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, তাঁর কবিতার নামও 'নবান্ন'। এ কবিতাটি সম্পূর্ণ পড়লে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সামান্য অংশে তা পাওয়া যায় না, তবু এখানে কিছু অংশ তুলে ধরছি,

> এসেছ বন্ধু? তোমার কথাই জাগছিল ভাই প্রাণে–
> কাল রাতে মোর মই প'ড়ে গেছে ক্ষেতভরা পাকা ধানে।
> ধান্যের ঘ্রাণে ভরা অঘ্রাণে শুভ নবান্ন আজ,
> পাড়ায় পাড়ায় উঠে উৎসব বন্ধ মাঠের কাজ।

এটুকু কবিতাংশ থেকে বোঝা যাচ্ছে, ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে, মাঠের কাজ বন্ধ, পাড়ায় পাড়ায় নতুন ধান প্রস্তুত করার কাজ চলছে। মানে ধান মাড়াই, সিদ্ধ করা, শুকানো, ঢেঁকিতে ধান ভানা এবং চাল তৈরি করার পর ভাত, পিঠা, পায়েসসহ নানা রকম উপাদেয় খাদ্য রান্নার প্রস্তুতি। জীবনানন্দ দাশ তাঁর বিখ্যাত 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে বাংলার চিরকালীন রূপ বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় তিনি নবান্নের কথাও লিখেছেন। কার্তিক

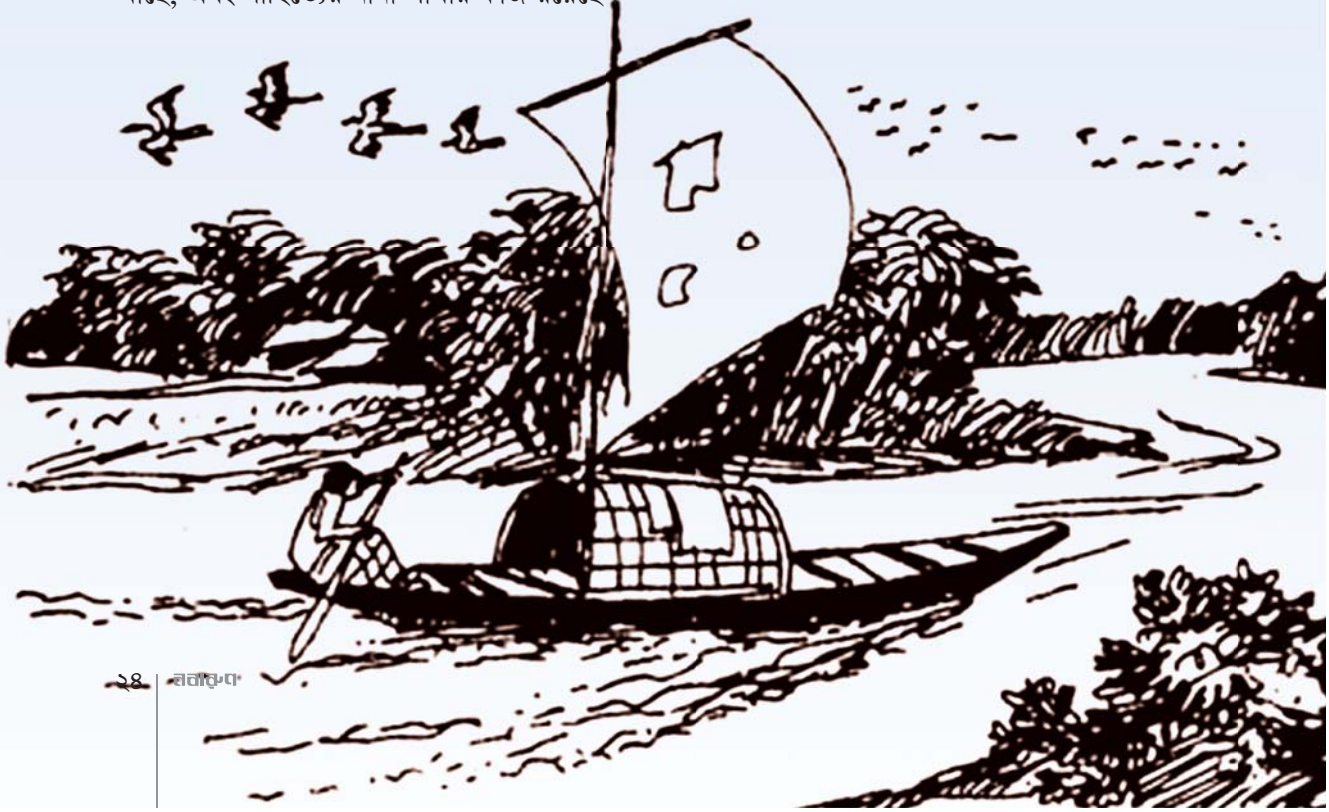

মাস ছিল তাঁর জন্মমাস, আর এ মাসের প্রতি একটা স্বাভাবিক ভালোবাসা ছিল তাঁর, তাই তিনি অঘ্রাণের পরিবর্তে কার্তিক মাসকেই নবান্নের মাস বলে অভিহিত করেছেন। বিশাল এই বাংলার কোথাও কার্তিক মাসে ধান কাটা হয়ে থাকে, আবার কোথাও অগ্রহায়ণ মাসে, এটা স্থান ভেদে ঋতুবৈচিত্র্যের বিষয়। কবি মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই আবার তিনি এই বাংলাতেই জন্মগ্রহণ করতে চেয়েছেন।

আবার আসিব ফিরে, ধানসিঁড়িটির তীরে- এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়, হয়তো-বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব কাঁঠাল ছায়ায়;

নবান্ন নিয়ে বাংলার বিভিন্ন যুগের কবিরা বিভিন্ন রকম কবিতা লিখেছেন। দেশজোড়া বিখ্যাত কবিরা অমরকাব্য রচনা করে গেছেন, আবার এ যুগের অনেক নতুন কবিও লিখেছেন। এখন এ যুগের কয়েকজন কবির কবিতা থেকে কবিতাংশ তুলে দেখি, কে কেমন করে নবান্নের কথা কাব্যভাষায় প্রকাশ করেছেন।

কবি জুলফিকার আলী তাঁর 'নবান্ন' কবিতায় নবান্নের একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছেন। আসলে সকল কবির বর্ণনা প্রায় একই ধরনের, কিন্তু শব্দ এবং পদ ব্যবহারের বৈচিত্র্যে তাঁরা ভিন্নতা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। জুলফিকার আলী লিখেছেন,

কাস্তে হাতে ছুটছে কৃষাণ
আমন ধানের মাঠে
পাকা ধান আনন্দে মেতে
কৃষাণেরা কাটে।
কাটার পরে মাড়াই করে
বাড়িতে ধান আনে
বিচালির গাদা দেবার পর
কাজের ইতি টানে।
কৃষাণীরা ঢেঁকিতে ধান
রাতদুপুরে ভানে
কুলায় গুঁড়ো ঝেড়ে তখন
আতপ চাল আনে।
আতপচালের নতুন ভাতে
নবান্ন উৎসব হয়
গ্রামজুড়ে সেই খুশির আমেজ
চতুর্দিকে বয়।

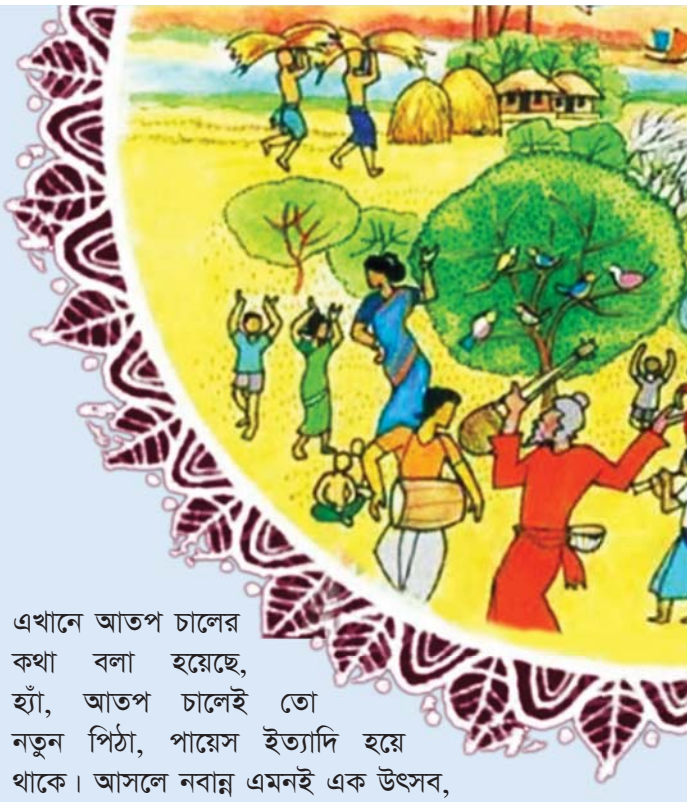

এখানে আতপ চালের কথা বলা হয়েছে, হ্যাঁ, আতপ চালেই তো নতুন পিঠা, পায়েস ইত্যাদি হয়ে থাকে। আসলে নবান্ন এমনই এক উৎসব, যেটা সরকারি নয়, ধর্মীয় নয় বরং সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবেই হয়ে থাকে। আর সেটি প্রাকৃতিক অনুপ্রেরণা থেকেই ঘটে, তাই এটি চিরন্তন। এবার দেখি উৎপলকুমার ধারার 'নবান্নের শেষে' কবিতার কিছু অংশ। উৎপলকুমার লিখেছেন,

দুয়ারে যখন অগ্রহায়ণ মাস
কুয়াশার ধোঁয়া ভেসে আছে চারপাশে
নবান্ন ঘিরে কৃষাণের উচ্ছ্বাস।
রহমান চাচা ভোরবেলা গাছে উঠে
কলসি ভরতি পাড়ে খেজুরের রস,
হিমেল বাতাস দলবেঁধে আসে ছুটে
আমলকি পাতা ঝরে পড়ে খসখস।

এ কবিতায় রহমান নামের একজন চরিত্র আছে, যিনি কবির কাছে চাচা বলে আপনজন। রহমান চাচা পেশায় একজন গাছি, তিনি খেজুরগাছ থেকে ভোরবেলা খেজুরের রস পেড়ে আনেন। এটি একটি বাস্তবচিত্র, এই চিত্রটি কবিতাটিতে অভিনবত্ব দিয়েছে। কবি রতন বসাক 'চাষীর জন্য' কবিতায় নবান্নের কথা লিখেছেন,

নবান্নতে ধানের গোলা
ভরতি থাকে চাষির ঘরে
পুজো দিতে গুড় মিশিয়ে
নতুন চালের পায়েস করে।

এখানে পূজার সাথে নবান্নকে এক সমন্বিত উৎসব হিসেবে দেখানো হয়েছে। সত্যিই তো, এ মাসে লক্ষ্মীপূজা হলে সেখানে নাড়ু-মুড়ি আরো কত রকমের খাদ্যসম্ভার তৈরি করা হয়, অতিথিদের আদরে-সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়।

কবি রত্না বসুর 'নবান্ন' কবিতায় একই রকম অগ্রহায়ণী দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। ধান কাটার সময় কৃষকরা এক ধরনের গান গায়, সেটির কথা কিন্তু এতক্ষণ বলাই হয়নি। তাছাড়া ঘরে ঘরে নতুন ধান উঠলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লাঠিখেলা, ভালুকনাচ, বাঁদরনাচ, পুতুলনাচ, যাত্রাপালা, পুঁথির আসর, ঘোড়দৌড়, ষাঁড়ের লড়াইসহ কত রকমের খেলাধুলা করার লোক আসে, নানা রকম লোকখেলা বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়, সেসবের কথা তো বলাই হয়নি। রত্না বসুর কবিতায় তার কিছুটা পাওয়া যাবে।

অঘ্রাণের আঘ্রাণ বঙ্গজুড়ে
নতুন ধানে হবে নবান্ন,
আনন্দ আর উৎসাহে মেতেছে চাষিরা
মাথায় বয়ে আনছে নতুন ধান্য।
অনেক পরিশ্রমে সবকিছু উজাড় করে
ফলিয়েছে সোনার ধান,
প্রতীক্ষার আজ হয়েছে অবসান
গাইছে আনন্দ গান।

এখানে যে প্রতীক্ষার কথা হয়েছে, তা কৃষক-পরিবারের লোকজন ছাড়া কেউ বুঝবে না। ধান যখন পেকে ওঠে বা পাকার সময় হয়, তখন বঙ্গোপসাগর থেকে মাঝে মাঝে আশ্বিনীঝড় আসে, তাতে পাকাধানসহ গাছগুলো মাটিতে নুয়ে পড়ে, সব ধান ঝরে যায়, বৃষ্টিতে ধুয়ে নিয়ে যায়। কৃষকদের এক বছরের ফসল এভাবে ভেসে গেলে ঘরে ঘরে হাহাকার লেগে যায়। এজন্য ওই সময়টা কৃষকেরা পাকা ধানের শীষগুলোকে কত যত্নে, কত আয়াসে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন, ধান কাটার আগ পর্যন্ত যেন বড়ো ধরনের ঝড় না হয়, ধান যেন নষ্ট না হয়। তাছাড়া আগেকার দিনে এই ধান কাটার সময়ে আরও কয়েক রকমের বিপদ ছিল। অত্যাচারী জমিদার, জোতদার, তালকুদারসহ প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তিরা

লাঠিয়াল বাহিনী পাঠিয়ে দরিদ্র ও দুর্বল কৃষকদের ধান কেটে নিয়ে যেত, সেটাও ছিল ভয়ের একটা কারণ। তাছাড়া পঙ্গপাল নামের একপ্রকার ফড়িংজাতীয় পতঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসত, এক রাতেই কয়েকটি ক্ষেতের ধান ওরা খেয়ে ফেলতে পারে। এই বাংলার কৃষকদের, আমাদের পূর্বপুরুষদের কত রকমের বিপদ ছিল, ভাবা যায়! এসব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক কৃষক পীরের মাজারে বা লক্ষ্মী ও শীতলা দেবীর মন্দিরে নতুন ধানের, নতুন চালের শিরনি মানত করতেন। এসবই আমাদের সংস্কৃতির অংশ।

মিষ্টি মৌ নামের একজন নতুন কবির কবিতায় দেখি এবার, তাঁর কবিতার নাম 'নবান্ন উৎসব'। তিনিও পূজার অনুষঙ্গটি নবান্নের সাথে একাকার করে দেখেছেন।

শরৎ শেষে হেমন্তের আগমনে
পুলক লাগে মনে।
ধানের গোলা ভরে ওঠে
নতুন ধানের ঘ্রাণে।
ঘরে ঘরে নবান্ন হয়
পিঠে-পুলি নলেন গুড়ে
ধান্যলক্ষ্মীর পূজা হয়
গেরস্থালীর ঘরজুড়ে।

এখানে যে মনে পুলক লাগার কথা বলা হয়েছে, সেটিও কৃষক পরিবারের লোক না হলে সহজে বোঝা যাবে না। কারণ, নতুন ধান উঠলে যে শুধু ঘরে ঘরে খাদ্যের উৎসব হবে, ব্যাপারটা শুধু তাই না। নতুন ধান উঠলে, সে ধান বিক্রি করে, চাল বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করা, নতুন ঘর তোলা, পুত্র বা কন্যার বিয়ের আয়োজন করা, বিবাহিতা কন্যাকে তার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনসহ নাইওর আনিয়ে পিঠা-পায়েস দিয়ে আপ্যায়ন করানো, আসন্ন শীতকে মোকাবিলা করার জন্য শীতবস্ত্র কেনা, লেপ-তোশক বানানো, কাঁথা সেলাই করানোসহ অনেক কিছু করা হয়। কাজেই একজন কৃষকের পুলক সবাই বুঝবে না। এটা বুঝতে হলে সহানুভূতির দৃষ্টি এবং সমানুভূতির হৃদয় থাকতে হবে।

রাশেদ আহম্মেদ সাদীও 'নবান্ন' নামে একটি কবিতা লিখেছেন। তিনি অতীতের কথা লেখেননি, আগামী দিনের কথা লিখেছেন।

নতুন ধানের চালে তৈয়ার
খৈ-মুড়ি অন্ন–
সোনার বাংলায় ফলবে সোনা
হবে উৎসব নবান্ন।

আমরাও কবি সাদীর মতো আগামী দিনের জন্য বাংলার ঘরে ঘরে বিপদমুক্তভাবে নতুন ধান উঠুক, নতুন ফসলের উৎসব হোক, সেটাই কামনা করি। ❑

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রামপাল কলেজ, মুন্সিগঞ্জ

গল্প

রাফি ও ময়না

আজহার মাহমুদ

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রাফি সোজা বেলকনিতে চলে যায়। কারণ তার প্রথম কাজ ময়নাকে একটুখানি দেখা। তার আদরের পাখিটির ঘর বেলকনির এক কোণে। রাফির কোনো বন্ধু না থাকায় ময়না পাখিটিই তার একমাত্র বন্ধু। রাফি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। বয়স আট বছর। স্কুল থেকে ফিরেই তার প্রিয় ময়নার সাথে বিকেলবেলাটা কাটে হাসিখুশিতে। এভাবেই তার দিন কেটে যায় আনন্দে। পাখিকে ঠিকমতো খাওয়ানো, পরিচর্যা করা সবকিছুই রাফি যত্ন সহকারে করে। রাফির বাবা-মা এসব দেখে মুচকি মুচকি হসে। অবশ্য রাফির বাবা-মা এতে মোটেও বেজার হয় না। তাদের একমাত্র ছেলের একটা সাথি হয়েছে এটাই তাদের জন্য আনন্দের।

কিন্তু সবার আনন্দের এই ময়নাটি একদিন সবাইকে চমকে দিলো। এক বিকেলে রাফি ময়নাকে নিয়ে খেলছে বেলকনিতে। এমন সময় বাইরে থেকে কয়েকটা ময়না এসে বেলকনিতে বসল। রাফির ময়না তাদের দেখতে পেয়ে তাদের কাছে উড়ে গেল। এরপর ওই ময়নাগুলোর সাথে বাইরে উড়ে গেল। রাফি দেখছে তার ময়না আকাশে উড়ে যাচ্ছে। অথচ এই ময়নাটা কখনও রাফিকে ছেড়ে যায়নি। কখনও বেলকনির বাইরেও যায়নি। এটা রাফিকে অবাক করে দিলো। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হলো রাফি তার ময়নার পথ চেয়ে বসে আছে। কিন্তু ময়নার কোনো খবর নেই। রাফি রাতে আর খাবার খেলো না। রাফির বাবা-মায়ের মনও খারাপ। একমাত্র ছেলের মন ভালো নেই, তাদের মন কীভাবে ভালো থাকবে। রাফির বাবা অবশ্য অনেক কিছু বলে রাফিকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে। নতুন একটা ভালো ময়না এনে দেওয়ার কথা বলছে।

কিন্তু রাফি এসব শুনছেই না। রাফি কিছুক্ষণ পর পরেই কান্না করছে। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে রাফি কখন যে ঘুমিয়ে গেছে রাফি নিজেও জানে না। কিন্তু তার ঘুম ভেঙেছে আজ খুব ভোরে। এত ভোরবেলায় রাফি কখনও উঠে না। কিন্তু এত ভোরে রাফির ময়নাও ডাকে না। রাফি ঘুম থেকে উঠে এক দৌড়ে বেলকনিতে গেল। বেলকনিতে গিয়ে দেখতে পায় তার বন্ধুকে। হ্যাঁ, ময়না পাখিটা ফিরে এসেছে। রাফিকে দেখা মাত্র রাফির কাঁধে এসে বসল ময়নাটি। রাফি তো আনন্দে আত্মহারা। বাবা-মাকে চিৎকার করে বলছে, আব্বু-আম্মু আমার ময়না চলে এসেছে।

রাফির বাবা-মাও ঘুম থেকে উঠে গেছে রাফির চিৎকারে। উঠে দেখে তাদের আদরের পুত্রের কাঁধে বসে খেলছে ময়না। এবার রাফির বাবা-মা দুজনই হাসছে। তাদের হাসি দেখে রাফি আর ময়নাও হাসছে। ❑

গল্পকার

কবিতাগুচ্ছ

পিঠা-পুলির আমন্ত্রণে

সুজিত হালদার

মিষ্টি করে বৃষ্টিটাকে ছুঁয়েই দেব দু-হাত ভরে
কানের ধারে বেড়ার ফাঁকে মস্ত বড়ো বাজ পড়ে।

ঝরছে ঝরা ভীষণ তাড়া দৃষ্টিজুড়ে এই ঘোরে
শব্দটা তো ভালোই ছিল বৃষ্টি ঝরার এই ভোরে।

ভরদুপুরে শনশনিয়ে ছুটলে তুমি কোন প্রাণে
ছুটলে তুমি মাঠ পেড়িয়ে কার্তিকের ঐ ধান ঘ্রাণে।
আমন ধানের আউশ ধানের পিঠা-পুলির আমন্ত্রণে
মনটা যে আজ ভরেই দিলে হেমন্তের এই অঘ্রাণে।

নবান্নের উৎসব

শাকিব হুসাইন

চাষির ঘরে ধান উঠেছে
দিচ্ছে দোলা প্রাণে
নতুন ধানের মিষ্টি সুবাস
মন ভরে যায় ঘ্রাণে ।

কদিন পরেই তৈরি হবে
নানান পিঠা-পুলি
পিঠার কথা শুনেই খুশি
চাষির মেয়ে ফুলি ।

নতুন চালের পায়েস হবে
পায়েস যে খুব মিষ্টি
পায়েস খাবার আনন্দেতে
নাচে ছোটো বিষ্টি ।

পিঠা-পুলি বানাতে যে
যায় পড়ে যায় সাড়া
নবান্নেরই উৎসবেতে
মেতে ওঠে পাড়া।

হেমন্ত এল

শারমিন জিকরিয়া

হেমন্ত এল হেমন্ত এল
ফুল পাখিদের সনে,
শিশির ভেজা দূর্বাঘাস
ঝিরিঝিরি বাতায়নে।

চলতে পথে মটরশুঁটি
কলাই ফুলের মেলা
শাপলা পদ্ম কচুরিপানা
মোরগ ফুলের খেলা।

সোনালি ধানে পাক ধরেছে
মৌ মৌ বাতায়নে
বউ ঝিয়েরা ব্যস্ত সবে
পিঠা-পুলির আয়োজনে।

আকাশ জুড়ে তারার মেলা
মিটিমিটি জ্বলে
এই না দেখে চাঁদমামা
খিলখিলিয়ে হাসে।।

হেমন্ত যে আসে

এস ডি সুব্রত

কচি সবুজ ঘাসের পাতায়
ভোরের শিশির হাসে
কুয়াশার চাদর গায়ে দিয়ে
হেমন্ত যে আসে,
পাকা ধানের গন্ধে আকুল
জুড়ায় কৃষক প্রাণ
কৃষান বধুর মনের মাঝে
আসে আনন্দেরই বান ,
সুখের জোয়ার সবখানেতে
ভরবে গোলা ধানে
সোনা বরন ধানের মাঝে
কৃষক স্বপ্ন বুনে ,
হেমন্তে তাই গাঁও গেরামে
শুনি খুশির কলরব
গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে
চলবে নবান্ন উৎসব ।

নবান্নের খুশি

মো. ইব্রাহিম রাজু

সোনালি ধানের স্বপ্নে বিভোর
ঘুম নেই তাদের চোখে
চাঁদের আলো করছে খেলা
কৃষান-কৃষানির মুখে।
মাটির রঙের শরীর তাদের
মাটির মতো মন
মাটির সাথে মিশে তারা
কাটায় যে সারাক্ষণ।
কচি কচি সবুজ ক্ষেতে
রৌদ্রেরা রং ছড়ায়
সে দৃশ্য দেখে কৃষকের মন
খুশিতে ভরে যায়।

[প্রথম পর্ব]

খবরদার বাইরে যাবে না। জানো তো এখানে নদীতে কুমির আর ডাঙায় বাঘ।

বন লাগোয়া রেস্ট হাউস। অদূরে সমুদ্র। সকালে লঞ্চ থেকে নেমেই বাবা একই কথা কানে জপছেন।

আসলে সুন্দরবনের কিছুই জানে না সে। মন্টু মামার কাছে কিছু গল্প শুনেছে অবশ্য। মাহিন স্যারের খুব ইচ্ছে ছিল স্কুল থেকে সবাইকে নিয়ে সুন্দরবন যাবেন। কিন্তু করোনার কারণে সব আটকে যায়।

তবে এবারের ঘটনাটা অন্যরকম।

ফাইনাল পরীক্ষা শেষ।

স্কুল নেই। পড়া নেই। কোচিংয়ের তাড়নাও বন্ধ হয়েছে। শুধু খেলে আর সময় কাটে না।

তাদের একটা ক্রিকেট দল আছে। দলের নাম ইয়ং টাইগার। মোহন ভাই ক্যাপটেন। দৌলতপুরের ব্লু স্টারের সঙ্গে খেলে এসেছে গত সপ্তায়। মারকুটে ব্যাটসম্যান হিসেবে তার একটু নাম হয়েছে। শচীনের খেলার ধার আছে নাকি তার ব্যাটে। সে অতো বোঝে না।

খেলার সময়টুকু ছাড়া ঘরেই শুয়ে বসে কাটছে তার। মাঝে মাঝে পল্টুকে নিয়ে উমেশচন্দ্র লাইব্রেরিতে যায়। রহস্য আর গোয়েন্দা বইগুলো খুব টানে। শিকার কাহিনিও পড়তে মন্দ লাগে না।

জিম করবেটের চিতা শিকারের ঘটনা গায়ের রক্ত হিম করে দেয়।

শিকারের রোগটা মোটামুটি এখান থেকেই মাথায় চেপেছে।

তাই বলে সেটা করবেট সাহেবের মতো রাইফেল আর বন্দুক নিয়ে নয়।

সে এমনিতে ভারি ভয়কাতুরে। ওসব বাঘ ভালুক তার সইবে না।

তার নেশা ধরেছে শিকার কাহিনির বইগুলো পড়া।

জিম করবেট কেমন যেন গুলিয়ে দিয়েছে মাথাটা।

মন্টু মামাকে কথাটা বলতেই নাক সিটকে বলল রাখ তোর করবেট। লাল চামড়া বলে বেটার এত খাতির। ও পারবে আমাদের সুন্দরবনের মেহের আলির সঙ্গে?

সুন্দরবনের বাঘের গল্প সে কিছু কিছু শুনেছে মামার মুখে। তবে পচাব্দী গাজীর সুন্দরবনের মানুষখেকো বইটা পড়ে একদম তাক লেগে গেছে।

মামাকে সে-কথাটা বলতেই একটু খুশির আভা ফুটে উঠল ঠোঁটে।

ও, পড়েছিস তাহলে! তোর বাপ তো কাউকে পাত্তা দিতেই রাজি না। ওনার ধারণা বাঙালি হলো ভিতুর ডিম। ওসব হলো গালগল্প।

তুমি বাঘ দেখেছ মামা?

দেখব না কেন? কতবার সুন্দরবন গেলাম চাঁদুদের শুধু দূর থেকেই দেখলাম। মুখোমুখি পেলাম না একবারও। আমার বন্ধুকের টিপ তো জানিস। খুলি উড়িয়ে দেবো না!

ওরে বাবা, কী সাহস তোমার!

সাহসের কী দেখলি! একবার মতিকাকু আর একজন শিকারি নিয়ে গেলাম সুন্দরবনে। তখন কতোইবা আর বয়স। শিকারি লোকটা ছিল বেজায় সাহসী। ওনার মুখে শুনেছিলাম মেহের গাজীর নাম।

মেহের বনে উঠলে বাঘ ভয়ে পালাতো। কিন্তু পালাবে কোথায়?

ওদের পায়ের নিশানা ধরে ধরে চলে যেত গহীন বনে।

পথে বন্দুকের ফাঁদ পেতে বসে থাকতো মেহের।

বাঘ যে পথে যায় সেই পথে আসে। আর ফাঁদে পা দিলেই ফটাস। ঠ্যাং উলটে কোঁত মেরে পড়ে বাবাজিরা।

মেহের মুখোমুখিও লড়েছে।

একবার তো লড়তে গিয়ে মরতে বসেছিল প্রায়।

হাতে বড়ো ক্ষত হয়ে রক্তারক্তি হয়েছিল।

বুড়ো মেহের অচল হলেও থেমে থাকেনি। শিকারের নেশা ভারি নেশা।

রোগ শোক নিয়েও অস্থির হয়ে পড়ে মানুষটা।

সবাই হা হা করে ওঠে।

এরকম বুড়ো-হাবড়া শরীর নিয়ে যাবে বাঘ শিকারে? এ কী ঘরের বেড়াল নিয়ে খেলা!

পাগল হয়ে যায়নি তো বুড়োটা।

সবাই বাধা দিয়েও ঠেকাতে পারল না তাকে।

রক্তে যার বান ডেকেছে তাকে আগলে রাখা সহজ নয়।

আধমরা শরীর নিয়ে বনে হাজির হলো এককালের পিলে কাঁপানো শিকারি মেহের।

সবার চোখ ছানাবড়া। কী হতে কী হয়ে যায় বলা যায় না।

শেষ বয়সে কী আছে বুড়োটার কপালে কে জানে!

আধাভাঙা শরীর নিয়ে হুংকার দিয়ে ওঠে মেহের।

তার শরীরে যারা রক্ত ঝরিয়েছে তাদের সহজে ছাড়বে না। হোক না শরীরে শক্তি কম। তাতে কী হয়েছে?

মরার আগে একটা প্রতিশোধ নিয়ে যাবে। যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে সুন্দরবনের ইতিহাসে।

হয়েও ছিল তাই।

মেহের গাজী কাহিল শরীর নিয়ে দুই-দুটো বাঘ মেরে পুরস্কার পেয়েছিল সরকারের কাছ থেকে।

সবাই ধন্য ধন্য করে উঠল মেহেরকে নিয়ে।

মামা কিছু সময় চোখ বন্ধ করে থেকে বললেন, কিরে বুঝলি কিছু! তোদের করবেট সাহেব ভারতের বনদাউড় থেকে এক আধটা ইঁদুর মেরে মাটিতে আর পা পড়ে না! ধুমধাম লিখে ফেললেন কয়েকখানা বই। আর কী! ঢোলের বাড়িতে নাম ফেটে গেল চারদিকে। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বল, তোর করবেট বড়ো, নাকি আমাদের মেহের গাজী?

পচাব্দী গাজীর নাম তো বললে না!

ও আর কী বলব! চেনা বামুনের পৈতা লাগে না।

তবুও বলোই না।

পচাব্দী হলো মেহেরের ছেলে। সেও বড়ো শিকারি। বাপের মতো নাম ডাক।

উনিও বাঘ মেরেছেন নাকি?

মারেনি মানে! বনে ওর চাকরিটাই তো ছিল মানুষখেকো মেরে তাড়ানো।

তা তোমার বাঘ শিকারের কী হলো মামা?

কী আর হবে! মতি কাকু আর শিকারি মিলে রাতেই নৌকা নিয়ে চলে গেলাম বনে। সরু খাল। ভাটিতে খাল শুকিয়ে বনের মাঝে আটকে গেছে নৌকা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। ওদিকে বাঘের হুংকারে বনবাদাড় কাঁপছে থরথর করে। ভয়ে কিচকিচ করে ছোটাছুটি করছে বাঁদরের দল। একটানা ঝিঁঝির ডাকে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। কি একটা পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে গেল ছরছর করে। নৌকায় ভয়ে মরছি আমরা। এই বুঝি চুপি চুপি এসে হামলে পড়ে বাঘ! মতি কাকু দোনলা বন্দুক তাক করে বসে থাকেন ছইয়ের তলায়। শিকারি চারদিকের ভাবসাব দেখে বলল, চলেন নামি। হরিনের খাওনের সময় হইছে।

মতি কাকু পাকা শিকারি। রাত-বিরেতে বহু শিকার করেছেন সুন্দরবনে। কিন্তু আজ কেমন যেন তাকে একটু শঙ্কিত মনে হলো।

শিকারির কথায় মাথা নেড়ে বললেন, না,এখন আর নেমে কাজ নেই। জায়গাটা সুবিধার মনে হচ্ছে না। ভোর হোক। সাত সকালে গাছে চড়লে হবে। অপেক্ষা করা ভালো। জোয়ার হলেই ওরা পানি খেতে নামবে। আপনারা এখন ঘুমোন। আমি বন্দুক নিয়ে জেগে থ াকি। পরে আমি ঘুমোলে আপনি গলুইতে বসবেন।

আমিও বাবার বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে এসেছি। দুএকটা বকটক মেরে হাত পেকেছে সামান্য।

কিন্তু কাকুদের গালগল্প শুনে শুনে আমারও খায়েশ চেপেছে বাঘ শিকারের।

ওসব হরিণ-টরিণ মেরে হাত গন্ধ করে লাভ নেই।

শুনেছি গুলি খেয়ে হরিণের চোখ ছর ছর করে কেঁদে দেয়। আমি বাপু ওসবে নেই। মারি তো গণ্ডার, লুটিতো ভাণ্ডার। এসেছি যখন বাঘ মেরেই যাব।

কাঁথার ভেতর লুকিয়ে থেকেও হাতের কাঁপন থামাতে পারছিলাম না। ওদিকে হালুম হালুম ডাকে বনজঙ্গল কেঁপে থরথরিয়ে উঠছে। নৌকার হাঁড়িপাতিলগুলো ঝনঝনিয়ে দুলে ওঠে বাড়ি খাচ্ছে কেবল।

বন্দুকটা বুকে চেপে ধরে আছি।

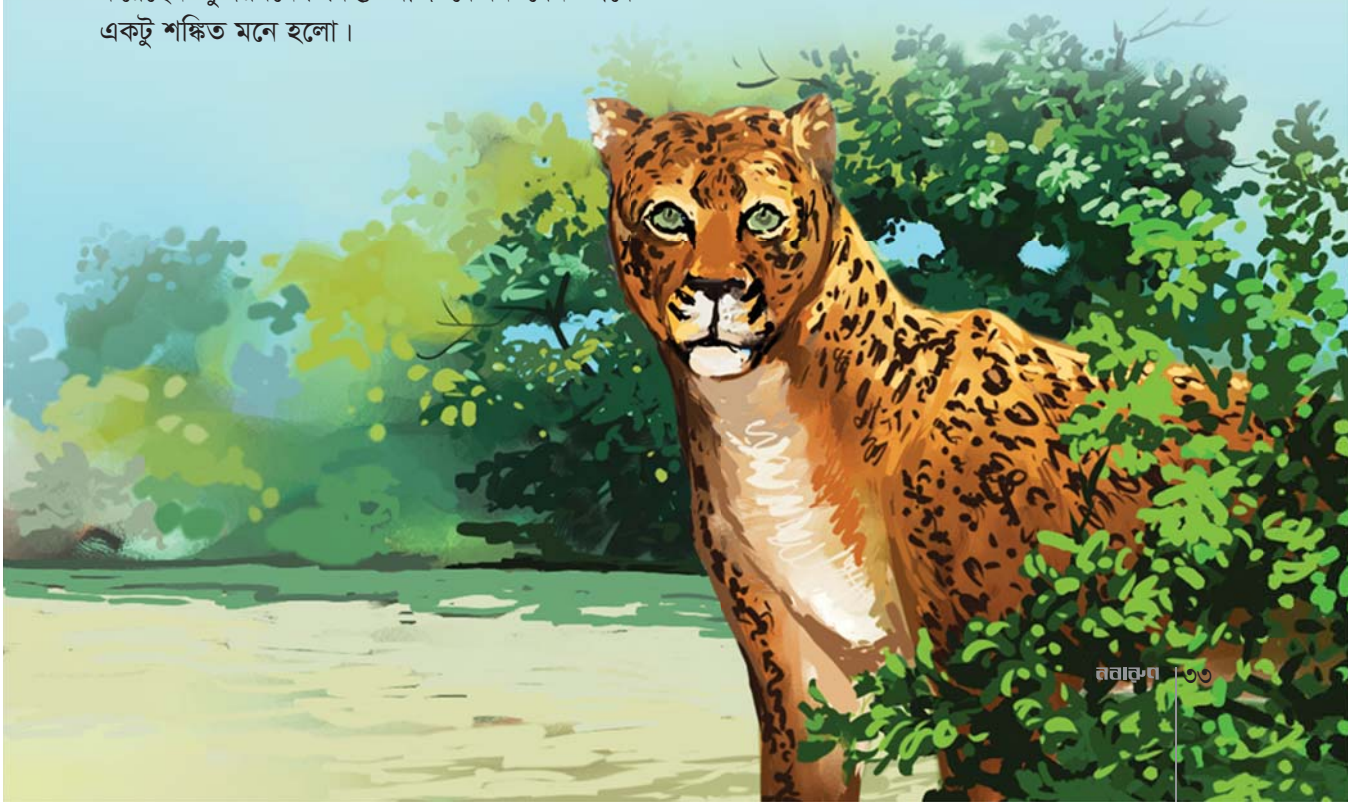

একনলা হলে কী হবে! ভারি তেজ। ফ্রান্সের সিম্পলেক্স গান বলে কথা। সবাই হাতে নিয়ে মাথা নাড়ে। দেখে সুখ। মেরেও সুখ।

বাবা কী মনে করে যেন বন্দুকটা তুলে দিলেন আসার সময়। সঙ্গে অনেকগুলো রেমিংটনের এলজি গুলি। ছররাও ছিল কিছু। ওটা রাখতে হয় বলে রাখা। আমি তো বাপু সুন্দরবনে বক মারতে আসিনি।

এদিকে হালুম হুলুমের কাঁপুনিতে এলজি ভুলে বক মারা ছররা ঢুকিয়ে একটু শক্তি এল মনে। আসুক না বেড়ালের বংশ। ঝেড়ে ফেলে দেবো না।

এবারের হালুম ডাকটা মনে হলো একদম কানের কাছে।

নৌকাটা দুলে উঠল অস্বাভাবিকভাবে।

শিকারি ফিসফিসিয়ে বলল, লক্ষণ ভালো না। সাবধান।

শুকনো খালে নৌকাটা মিশে আছে দুই তীর ঘেঁষে।

দূর থেকে বাঘ টের পায় মানুষের গন্ধ। এমন শিকার পেলে তারা কী সহজে ছেড়ে দেবে!

মতি কাকুর কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

শিকারি অভয় দিয়ে বলল, রাত পোহানোর বেশি বাকি নাই। চলেন গাছে উঠে বসি। খোকা নৌকায় থাকুক।

না,না, আমিও যাব।

আহা, থাকতে বলছে থাক না। মাঝি তো আছে। ভয় কী?

আমিও গাছে উঠব বন্দুক নিয়ে।

এই সেরেছে তুই কী গাছে উঠতে পারিস।

না, পারি না। দেখিয়ে দিলে ঠিকই পারব।

মতিকাকু রীতিমতো বিরক্ত, তুই কেন এসেছিস বলতো?

বাঘ মারতে এসেছি।

খুব ভালো, একটা বক মেরে এতো সাহস!

আপনারা ঘুমান। আমি বন্দুক নিয়ে পাহারা দিই।

শিকারি কুলকুলিয়ে হেসে উঠল, চলো খোকা তুমি আর আমি গিয়ে বাঘ মেরে আসি। ঘুমিয়ে থেকে কী হবে! তাই যান।

মতি কাকু ফুড়ন কেটে কোল ভাঁজ হয়ে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন।

একটু মন খারাপ হয়ে গেল। কেউ তাকে খুব একটা আমলে আনছে না।

ফরেস্টারের অফিসে পাস নিতে গিয়েও এমনটা হয়েছিল।

ফরেস্টার হেসে বলেছিলেন, কী খোকা তুমিও শিকারি নাকি! তা কী শিকার করবে? বাঘ না ভালুক!

মানুষটা হাসিখুশি স্বভাবের। নতুন চাকরি। বনবাদাড়ে মন টিকছে না।

বই পড়ে আর গান শুনে সময় কাটে।

আড্ডা জমাতে তাদের রাতে রেখে দিলেন বাংলোতে।

মতিকাকু না না করেও লাভ হলো না।

রাতের খানাপিনা শেষে জমে উঠল আড্ডা। কতো গল্প। ভয়ে শিহরণে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।

গত মাসেই নাকি গোলপাতা কাটতে গিয়ে বাঘের পেটে গেছে একজন বাওয়ালি।

ছেলেটা অল্পবয়সি। কেবল নতুন বিয়ে করে বউ রেখে এসেছে বাড়িতে।

ওর দলের লোকজন বহু খুঁজেও দিকনিশানা পায়নি।

অফিসের গার্ডকে পাঠিয়েছিলাম রাইফেল নিয়ে। বারকয়েক তালাশ দিয়েও লাভ হলো না। ওর বাপটা উথাল-পাতাল করে কাঁদলো কয়েকটা দিন। এই কষ্ট সহ্য হয় না!

আমরাও তো কত রকম ঝুঁকির মধ্যে দিন কাটাই। কতক্ষণ সতর্ক থাকা চলে?

আগে খুব কষ্ট হতো। ভয়ে ভয়ে থাকতাম এক অজানা আশঙ্কায়।

দিনটা যেমন তেমন, রাতটা একদমই পার হতে চাইত না।

বলতে গেলে পুরো রাতই জেগে বসে থাকতাম।

এই বুঝি বাঘ এল। ডাকাত এল। ভূত-পেত্নীরও ভয়।

অদ্ভুত নিঝুম থমথমে চারদিক। একটানা ঝিঁঝির ডাকে কেমন তালা লেগে যায় কানে। হঠাৎ হঠাৎ ডেকে ওঠে দুএকটা রাতজাগা পাখি। বাঁদরের কিচিমিচি পাশাপাশি বনজঙ্গল কাঁপিয়ে সহসা ভেসে আসে বাঘের হুংকার।

এ সময় আশ্চর্য এক হাহাকার চেপে বসে মনে। কেবলই প্রশ্ন জাগে এ কোথায় এলাম?

কেন এলাম?

এই বিশাল নির্জনতার ভেতর আমার কোনো অস্তিত্ব আছে কী!

নিজেকে এভাবে খুঁজতে খুঁজতে একসময় কখন যেন আবিষ্কার করলাম অন্য এক আমিকে।

এখন আর আগের মতো হয় না।

সেই পালাই পালাই ভাবটা কেটে গিয়ে কখন যেন রূপান্তরিত হলাম অন্য মানুষে।

কোনো কিছু নিয়ে এখন আর অভিযোগ নেই। বড়ো আপন হয়ে গেছে সবকিছু। এমনকি ওই যে বাঘের গর্জন... তাতেও কোনো ভাবান্তর হয় বলে মনে হয় না।

ওরা আছে ওদের মতো। কী হবে অতো ভেবে?

আমার তো মনে হয় ওই মানুষখেকো রোজ রাতে এসে দেখে যায় আমাকে।

ও যদি আসলে আমাকে নিয়ে যেতে চায় তবে কী ঠেকানোর কায়দা আছে!

এই বাংলোটা তো এক রকম অরক্ষিত বলা চলে। গার্ড একজন রাইফেল নিয়ে পাহারা দেয় বটে, ওটা কোনো কাজের নয়।

বাংলোর বাইরে যে কাঁটাতারের বাউণ্ডারি সেটাও কী যথেষ্ট একটা মানুষখেকো ঠেকাতে।

আসলে ওদের জন্য আজকাল খুব মায়া হয় আমার।

ওরা আছে বলেই আমাদের বনটা এখনও টিকে আছে।

জীবজন্তুগুলো এখনো হারিয়ে যায়নি। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় সুন্দরবনে একসময় গণ্ডার ছিল।

আজ সব হারিয়ে গেছে মানুষের ভুলে। আমার তো মনে হয় এমন একদিন আসবে যখন একটা বাঘ-হরিণও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুন্দরবন হারিয়ে যাবে সমুদ্রের পেটে।

মোরেলগঞ্জের মোরেল সাহেব তো কম ক্ষতি করেননি এই বনের। সুন্দরবন লিজ নিয়ে ৬০ হাজার বিঘা জমি আবাদ করেছিলেন মোরেল। বন সাফ করতে বহু লোক এসেছিল বরিশাল থেকে। এরা এখন পাকাপাকি বসত গেড়েছে আশেপাশের গ্রামে।

হয়ত গোটা খুলনাটাই একদিন ছিল সুন্দরবনের পেটে।

কিনা ছিল সুন্দরবনে! বড়ো বড়ো প্রাসাদ, ইমারত, দিঘি, লবণ কারখানা, অস্ত্রাগার কত চিহ্ন ছড়িয়ে আছে সুন্দরবনের সর্বত্র।

আমার খুব ইচ্ছে হয় ওরকম একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে গিয়ে থাকি।

শুনেছি সাপকোপ আর বাঘের অভয়ারণ্য হয়ে আছে সেগুলো। হলোই বা। একদিন মানুষ ছিল। এখন জীবজন্তু থাকে। শুধু প্রভেদ এই।

অথচ এই সুন্দরবন নিয়ে কত মিথ। কতই না রূপকথার গল্প।

যে-কোনো অজানাকে ঘিরে পাখা মেলে নানা রকম কুসংস্কার।

এখানেও তা আছে। নানাভাবে আছে।

এই যে বাওয়ালি, জেলে আর মৌয়ালরা বনদেবীকে খুশি করে বনে ঢুকছে এটার কী ভিত্তি আছে?

দুবলার চরে এখন তো এই পুজোটুজো নিয়ে রীতিমতো মেলা বসে গেছে।

কত দূরদূরান্ত থেকে পূণ্যার্থীরা আসছে দলবল নিয়ে।

সাগরে স্নান করে সব পাপতাপ মুছে তারা ফিরে যায় আপন সংসারে।

এই সুযোগে ওঁত পেতে থাকে অসাধু চোরের দল।

ওরা ফাঁদ পেতে চুরি করে রাজ্যের হরিণ। শুধু মেলাই বা বলি কেন এই চুরি চামারি হররোজ চলছে।

কেউ মারছে হরিণ। কেউ কাটছে গাছ। কেউ ঝেড়ে নিচ্ছে গোলপাতা। মৌচাকের মধু। এতো চুষে খেলে আর থাকবে কী?

তারপর আছে ডাকাতের ত্রাস। ওদের দাপট বাড়ছে তো বাড়ছেই।

আমরা গুটিকয় মানুষ কী করে আগলে রাখব এতো বড়ো বন!

একসময় ভাবতাম আর নয়। অনেক হয়েছে। এবার ফিরে যাই।

কী আছে এই বন বাদাড়ে?

সব কথা বাদ দিই। খাবার পানিটুকু পর্যন্ত টেনে আনতে হয় বাইরে থেকে।

মা বলেন, অতো কষ্ট করে কাজ নেই বাবা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আয়।

না, আমার আর ফেরা হলো না।

এখন সব সয়ে গেছে। কোনো কিছুর জন্য কষ্ট হয় না।

কী মন্টু সাহেব, তুমি থাকবে নাকি আমার সঙ্গে। তোমার মতো একটা ভাই আছে আমার। খুবই দুষ্টু। ওর খুব শখ একটা বাঘ শিকার করবে। তুমি যেমন চাও তাই না...।

লজ্জায় মরে গেলাম। ভারি অদ্ভুত ছিল মানুষটা। সারাটা রাত পার হয়েছিল গালগল্পে। মতিকাকুও যেমন। উনিও তেমন। যাকে বলে সমানে সমান।

আমাদের সকাল হলো অবশেষে।

জোয়ারে ভেসে উঠেছে আমাদের নৌকা। পাখিদের ডাকাডাকিতে কান রাখা যায় না। হালকা বাতাস দিয়েছে। সবুজ টাটকা ঘ্রাণে নাক ভরে উঠছে।

হালকা আঁধার ছড়িয়ে আছে তখনও।

কাক আড়মোড়া ভেঙে লাফিয়ে উঠলেন, কী ব্যাপার তোমরা এখনো ঘুমিয়ে আছো? কখন নামবে!

আমরা তৈরি হয়েই ছিলাম।

শিকারির মতো আমিও সেজেগুঁজে নিয়েছি। ঘাড়ে বাঁধা বন্দুক। কোমরের মোটা বেল্টে গোঁজা সার সার টোটা। মাথায় কানটুপি। পোকার কামড় ঠেকাতে এতো আয়োজন।

মতিকাকু আড়চোখে তাকিয়ে ফুড়ন কাটলেন, একটা দড়িটড়ি সঙ্গে নাও। বাঘ শিকারে যাচ্ছো, গাছে চড়ে কোমর টোমর বেঁধে রাখতে হবে না ডালের সঙ্গে!

একটু লজ্জিত হলেও ভড়কে গেলাম না। শিকারি লোকটা সব পই পই করে শিখিয়ে নিয়েছেন আমাকে।

মৃদু কেশে বললাম, তাও নিয়েছি। ছুরিও পকেটে আছে।

আর দেরি নয়।

সূর্য ওঠার আগেই গাছে চড়ে বসতে হবে। সাত সকালে হরিণের দল লাইন দিয়ে পানি খেতে নামে। এই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে।

আমরা তিনজন তিন গাছে চড়লাম। কুঁজো বক-মারা শিকারি। ভাব দেখে মনে হচ্ছে জোড়া বাঘমারা সেই মেহের আলী!

সেই তেজ। সেই হুংকার।

হুংকারের আওয়াজ বেরোল না। বুক ঢিপঢিপ শুরু করল।

শিকারি বানরের গলায় আওয়াজ দিচ্ছে থেমে থেমে।

হরিণ পটানো বুদ্ধি। বানরের ডাকাডাকি শুনে অনেক সময় কেওড়া খাওয়ার লোভে ছুটে আসে হরিণ।

হরিণ আসার আগে ঝাঁক বেঁধে এলো রাজ্যির বাউড়ে পোকা।

মনে হলো সমস্ত শরীর ছিবড়ে খাবে। অবস্থা এমন হলো যেন ভিক্ষা দরকার নেই, কুকুর ঠেকাও।

কিন্তু কে ঠেকাবে কার কুকুর?

পোকার আক্রমণে রীতিমতো পাগল হবার অবস্থা। ❑

[চলবে]

গল্পকার

মনটা শুধু টানে

ফরিদ সাইদ

দালানকোঠার জটিল শহর
ভাল্লাগে না মোটে
শাপলা ফোটা বিলের ধারে
মনটা আমার ছোটে।

তরুণ-যুবা সাঁতার কাটে
শান্ত সতেজ খালে
ট্যাংরা,পুঁটি, পাবদা, বেলে
ধরে জেলের জালে।

আঁকাবাঁকা মেঠোপথে
নানান লোকে হাঁটে
আপন মনে গাঁয়ের সবাই
সারাটা দিন খাটে।

মন কেড়ে নেয় পাখপাখালি
কিচিরমিচির গানে
নয়ন জোড়া শ্যামল মাঠে
মনটা শুধু টানে।

জেব্রা

সরকার জাহিদুল ইসলাম

জেব্রা মামার গায়ে কে মা
এঁকে দিলো বারকোড
স্ক্যান করে কি পাওয়া যাবে
সিলেবাসের পড়া মোট?
নাকি বলো পাওয়া যাবে
গহীন বনের তথ্য?
কোথায় থাকে লুকিয়ে সব
জিন পরি আর দৈত্য।

তাইলে যে মা ভালো হবে
মজা হবে ভারি
জেব্রা কে যাই নিয়ে যদি
সাথে করে বাড়ি!

ঘরের কোণে চড়ুই পাখি

মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান

ঘরের কোণে চড়ুই পাখির বাসা
ফুড়ুৎ-ফাড়ুৎ হঠাৎ যাওয়া-আসা
ঘরের পাশে বরই গাছের ডাল
কাঠের ফ্রেমে- শক্ত টিনের চাল ।
চালের সাথে ডালের ঘষাঘষি
চড়ুই পাখির সে কি হাসাহাসি!
হাসির শব্দে ভাঙলো চাষির ঘুম
চড়ুই পাখির বরই খওয়ার ধুম..
চড়ুই ওড়ে, বরই পড়ে টুপ্
বরই পড়ে- চড়ুই থাকে চুপ!
ঘরের কোণে চড়ুই পাখির বাস
উড়োউড়ি দেখছি বারো মাস ।

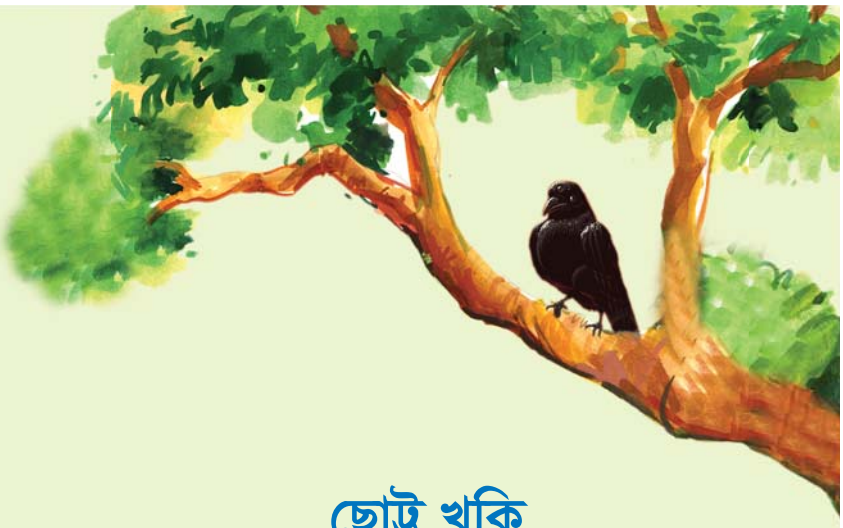

রূপকথার রাজা

জানে আলম মুনশী

আজব দেশের আজব রাজা
মাথা ছোটো পেটটা তাজা,
চুল নাই মাথায় টাক যে ভরা,
পড়ছিল ভাই দারুণ খরা।

হাঁটছে রাজা রাস্তা দিয়ে,
সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে নিয়ে।
হঠাৎ রাজা ভিমরি খেয়ে
গাছের নিচে পড়ল যেয়ে।

সেই দেশের এক দুষ্টু কাক,
দেখল রাজার খোলা টাক।

অমনি দিলো ইয়ে... করে,
রাজার মাথা গেল ভরে।
রেগে মেগে বলল রাজা।
কাক বেটারে দিব সাজা।

ডাকতো ওরে- জিগাই ধরে।
আমার সাথে ঠাট্টা করে?

কাক ডাকলো কা কা...
চললাম আমি টা টা...।
কেমনে দিবে সাজা?
রূপকথার সেই রাজা।

ছোট্ট খুকি

ইলিয়াছ হোসেন

ছোট্ট খুকি বলে মাকে
আর পড়ব কত?
খেলতে আমায় ডাকছে দেখো
প্রজাপতি শত।

ভোরের সূর্য বলছে আমায়
আর থেকো না ঘরে,
মেঘের সাথে লুকোচুরি
দেখো হৃদয় ভরে।

সবুজ ঘাসের শুভ্র শিশির
আমায় কাছে ডাকছে,
বিলের ঝিলের পদ্ম শাপলা
দেখতে দারুণ লাগছে।

জোনাকিরা বলছে যেতে
গোলাপ ফুলের বনে,
সেথায় আমি করব খেলা
ফুলপরিদের সনে।

ছোট্ট খুকিকে বলে মা
আরও একটু পড়ো,
লেখাপড়া শিখে তুমি
সুন্দর জীবন গড়ো।

ভোলা যায় না ভোলাগঞ্জ

সাবিনা ইয়াসমিন

সিলেটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সব সময়ই পর্যটকদের আকর্ষণ করে। অসংখ্য চা বাগান, পাহাড়ি নদীর স্বচ্ছ স্রোতধারা, ঝর্ণা আর হাওর-বাঁওড়ের দেশ সিলেট। ব্যক্তিগতভাবে আমার একাধিকবার সিলেট যাওয়ার সুযোগ হলেও সম্প্রতি প্রায় চল্লিশ জনের একটি অফিশিয়াল টিমের সাথে সিলেট ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও আনন্দটা ছিল অন্যরকম। ৯ই অক্টোবর রাত সাড়ে দশটায় রিজার্ভ বাসে আমরা রওনা হই সিলেট শহরের উদ্দেশে। সকালে গিয়ে পৌঁছাই সিলেট পর্যটন মোটেলে। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে প্রায় ৯০ ফুট উঁচু টিলার ওপরে এই মোটেলের অবস্থান।

সিলেটে তিন দিন অবস্থানের সময় আমরা বেশ কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করি। এর মধ্যে তৃতীয় ও শেষ দিন ছিল ভোলাগঞ্জ সফর। এদিন সকাল ১০টায় চারটি রিজার্ভ মাইক্রোবাস নিয়ে আমরা পর্যটন মোটেল থেকে রওনা হই। দেড় ঘণ্টার ব্যবধানে আমরা পৌঁছে যাই ভোলাগঞ্জ ধলাই নদীর তীরে ১০ নম্বর ঘাটে। সেখান থেকেই চোখে পড়ে সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত প্রাকৃতিক অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর। এটি দেশের সর্ববৃহৎ পাথর কোয়ারি। ভোলাগঞ্জ সীমান্তে প্রাকৃতিক দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের উঁচু উঁচু পাহাড়। আর পাহাড়ের পাদদেশে বালুময় প্রান্তর, তার ওপরে ছড়ানো ছোটো-বড়ো সাদা পাথর। সাথে মিশে আছে প্রশস্ত ধলাই নদী। সে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য!

আরো কাছে থেকে সে সৌন্দর্য উপভোগ করতে আমরা চারটি নৌকা রিজার্ভ করে ১৫ মিনিটের নদীপথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যাই কাঙ্ক্ষিত সাদা পাথর এলাকা বা জিরো পয়েন্ট। ধলাই নদীর উৎস মুখের পাথর পরিবেষ্টিত জায়গাটুকু ভোলাগঞ্জ জিরো পয়েন্ট বা সাদা পাথর নামে সবাই চেনে।

যত কাছাকাছি যাই ততই এর অপরূপ রূপে মন আন্দোলিত হয়। মাথার উপরে সূর্যের চোখ রাঙানি, নিচে কখনো পুরু বালি আবার কখনো বিভিন্ন আকৃতির পাথর, এমন অমসৃণ মিনিট দশেকের পথ হেঁটে যেতে

একটুও খারাপ লাগেনি। ইপ্সিত গন্তব্যে পৌঁছে সবার সে কি উচ্ছ্বাস! যতদূর চোখ যায়, চোখে পড়ে মেঘের সাথে মিতালি করে সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা সবুজে ছাওয়া সব পাহাড়। সেই পাহাড়ের গা বেয়ে প্রবল বেগে নেমে আসছে স্বচ্ছ পানির বিশাল ধারা, মিশছে নদীতে। স্রোতস্বীনি ধলাই নদী বাংলাদেশ অংশে প্রবেশ করে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে চারপাশ ঘুরে আবার মিলিত হয়েছে। সবুজ পাহাড়, মেঘের হাতছানি আর বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারের খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে নেমে আসা রং-বেরঙের অসংখ্য পাথর নদীর বুকে মিলেমিশে ভোলাগঞ্জের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।

বর্ষাকাল বিশেষ করে জুন থেকে অক্টোবর ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর ঘুরতে যাওয়ার উপযুক্ত সময়। এ সময় পাহাড়ি ঢলের স্রোত খুব বেশি থাকে। আমাদের ভোলাগঞ্জ সফরটা ছিল ১২ই অক্টোবর। পানি নিমজ্জিত সাদা পাথরের সৌন্দর্য তখন কানায় কানায় পূর্ণ। নদীর কূল ঘেঁষে সারি বাঁধা নানান রঙের বাহারি ছাতাওয়ালা কাঠের আসনগুলো যেন কক্সবাজারের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল এ যেন সাগর

পারের কোনো সৈকত। এগুলোতে বসেই চারপাশের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করা যায়। আমরা তো পাথুরে নদীর কাচস্বচ্ছ পানি দেখে মুগ্ধ হয়ে নদীতে নেমে পড়ি। কেউ পানিতে শুধু পা ডুবিয়ে হেঁটে হেঁটে মনোরম দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে, কেউ কেউ আবার অর্ধ শরীর ডুবিয়ে পাথরের ওপর বসে পাথরের ওপর দিয়ে স্বচ্ছ জলের কলকল বয়ে চলা উপভোগ করে, আর অধিকাংশরাই পানিতে নেমে ডুবসাঁতারে মেতে ওঠে। শত লাফালাফি করলেও এখানে পানি ঘোলা হয় না, কারণ পানির নিচে বিছানো রয়েছে পাহাড় থেকে নেমে আসা নুরি আর পাথরের পুরু স্তর। আমাদের কেউ কেউ আবার সাঁতরে স্রোতস্বীনি নদী পার হয়ে ওপারেও গিয়েছিল। সব মিলিয়ে কোলাহলপূর্ণ ও আনন্দমুখর এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। একেক জনের উচ্ছ্বাস দেখে মনে হচ্ছিল সবাই যেন ফেলে আসা কৈশোরে ফিরে গেছে।

আমাদের অবস্থা দেখে ফুচকাওয়ালা ও ঝালমুড়িওয়ালাও হাঁটু পানিতে নেমে ফুচকা-ঝালমুড়ি বিক্রি করা শুরু করে। পানির মধ্যে দাঁড়িয়েই আমরা এসব খাচ্ছিলাম ও গল্প করছিলাম। এর মধ্যে কখনো আবার ডুব দিয়ে পাথর তুলে আনন্দ করি। আবার কখনো হাঁটু পানিতে বসে থাকি। সব মিলিয়ে খুব উপভোগ্য হয়েছিল দিনটি। এরপর ফেরার পালা। ভেজা গায়েই পাথর প্রান্তর পাড়ি দিতে গিয়ে পাথরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আমাদের সাথের মেয়েদের অনেকেই পাথর কুড়িয়ে হাতে জমা করতে থাকে। কিছুদূর যেতেই হাতেরটা ফেলে অপেক্ষাকৃত সুন্দর পাথর আবার তুলে নেয়। এ সময় সবাই যেন শৈশবে ফিরে গিয়েছিল। তখন কবি জসীম উদদীনের বিখ্যাত নিমন্ত্রণ কবিতার দুটি চরণ মনে পড়ছিল :

ঢেলা কুড়াইয়া গড়ি ইমারত সারা দিনমান ধরি,
সত্যিকারের নগর ভুলিয়া নকল নগর গড়ি।

ভোলাগঞ্জের আনন্দঘন স্মৃতি মনে থাকবে অনেকদিন। এখনো যেন সেই সাদা পাথর আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ❑

সিনিয়র সাবএডিটর, ডিএফপি, ঢাকা

সেনেগালের রূপকথা

হায়েনা ও অস্ট্রিচ পাখি

হাসান হাফিজ

দুই বন্ধু। অস্ট্রিচ পাখি আর হায়েনা। অনেক দিনের চেনাজানা, মেলামেশা। হায়েনার ছানাপোনা, অস্ট্রিচ পাখির বাচ্চারাও বন্ধু। একসঙ্গে খায়দায়। খেলাধুলা করে। ঘন অরণ্যে ঘোরাঘুরি করে। বেশ ভালোই কাটছিল দিনকাল। কিন্তু হায়! চিরকাল তো একরকম যায় না। ওলটপালট হয়ে যায় কত কিছু।

কঠিন আকাল দেশে। খানা-খাদ্যের বড্ড অভাব। যা আছে, অতি সামান্য। সবাই খাবারের খোঁজে হন্যে দিনমান ঘোরে। খুব কমই জোটে। অল্পস্বল্প যেটুকু পাওয়া যায়, তা দিয়ে পেট ভরে না। কী কঠিন দিন পড়ল। পশুপাখি, জীবজন্তু সক্কলে দিশেহারা। কবে যে এই আকাল দূর হবে। সেই চিন্তায় সবাই অস্থির।

হায়েনার মনমেজাজ ভালো নেই। কী করে ভালো থাকবে? ছানাপোনাদের মুখে খাবারের দানা তুলে দিতে পারছে না। বাচ্চাগুলো শুকিয়ে চিমসে হয়ে পড়ছে দিন দিন। বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকানো যায় না।

অস্ট্রিচ পাখি ততটা বিপদে পড়েনি। সে ডানা মেলে দূরদূরান্তে উড়ে যায়। আতিপাতি করে খানা-খাদ্য খুঁজে আনে। তার বাচ্চারা বেশ ভালোই আছে। খাবারের কোনো সমস্যা নেই। আকাশ কী, কতটা ভয়ানক সেটা তারা টেরই পাচ্ছে না।

নেকড়ে পরিবারের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। বাচ্চারা খিদের চোটে চিল্লাচিল্লি করে। মা-হায়েনা হাল ছেড়ে দিয়েছে। বাচ্চাদের বলেন বাপুরা খিদে সহ্য করতে শেখো। আমি আর শিকার করতে পারছি না। বাচ্চারা একথা শুনে আরো কাঁদে। শেষমেষ মা-হায়েনার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি আসে।

পরের দিনের ঘটনা। অস্ট্রিচ পাখি গেছে শিকারে। অনেক দূরে হয় তো। সেজন্যে ভোরবেলায় সে বেরিয়ে পড়ে। ফের সন্ধ্যার পর মা হায়েনা তার দুটি বাচ্চাকে সঙ্গে নিল। পা টিপে টিপে গিয়ে হাজির হলো অস্ট্রিচ পাখির আস্তানায়। অস্ট্রিচের দুটি ছানাকে নিয়ে চলে গেল নিজের বাড়িতে।

সন্ধ্যার পর অস্ট্রিচ পাখি ফিরে এল। এ কী কাণ্ড!

ছানারা কোথায়? হায়েনার বাচ্চা দু'টি হুটোপুটি করছে মহানন্দে। খাবারদাবার কিছু ছিল। সব চেটেপুটে সাবাড় করে ফেলেছে তারা। অস্ট্রিচ ওদের কাছ থেকে পুরো ঘটনা শুনল। ঝটিতি গিয়ে হাজির হলো হায়েনার বাড়ি।

কাঁদো কাঁদো হয়ে অস্ট্রিচ বলে, এ কী করছ তুমি। আমার বাচ্চাদের তুমি নিয়ে এসেছে কেন? ওদের ফেরত দাও। খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়াব। হায়েনা বলে,

উহুঁ। সেটি হচ্ছে না। ওরা এখন আমার বাচ্চা। তোমার বাসায় যারা আছে, ওদের যত্নআত্তি করো গে যাও। বেচারারা খিদের চোটে ভীষণ কাহিল হয়ে পড়েছে। জলদি ফিরে যাও। পেট ভরে খাইয়ে ওদের ঘুম পাড়িয়ে দাও।

অস্ট্রিচ একথা শুনে হতবাক। কী বলছে এ? হায়েনার কী মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে? উটকো ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি।

অস্ট্রিচ অঝোরে কাঁদছে। যাকেই সামনে পাচ্ছে, তাকেই বলছে হায়েনার জুলুমের কথা। সবাইকে অনুনয় করছে।

তোমরাই এর বিচার করো। আমি যেন আমার ছানাদের ফিরে পাই সে ব্যবস্থা করো। হায়নাকে বোঝাও। দোহাই লাগে। তোমাদের পায়ে পড়ি।

কিন্তু হায়! কেউ সাড়া দিচ্ছে না। হায়নাকে চটাতে চায় না কেউ। অস্ট্রিচ হতাশ। কী হবে এখন? কোনো থৈ পাচ্ছে না সে। বাচ্চা ছিনতাইয়ের ঘটনার কি কোনো বিচার-আচার নেই? দুনিয়ার এখন ঘোর কনিকাল চলছে।

শেষতক সমাধান একটা হলো।

বিচার গেল সিংহের কাছে। উনি হচ্ছে বনের রাজা। সব জীবজন্তু তাকে মানে। না মেনে উপায় নেই। অবাধ্য হলে খবর আছে। জান চলে যাওয়ার আশঙ্কা তখন।

সিংহ রাজা মন দিয়ে শুনলেন। যা যা ঘটেছে, সব। গর্জে উঠলেন পশুরাজ।

কেশর ফুলিয়ে বললেন,

হায়েনা, সাবধান হয়ে যা। অস্ট্রিচের বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দাও। যা বলছি, জলদি করো। খুবই অন্যায় কাজ করছ তুমি। আমার কথা একটু এদিক সেদিক করছ কি মরছ।

মামলা ডিসমিস।

জিতে গেল অস্ট্রিচ পাখি।

ফিরে পেল ছানাদের। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে ওদের। এখন জানে পানি পেল।

হায়েনা গেল হেরে। তার শাবকেরা ফিরে এল তার কাছে। এইসঙ্গে আরো একটা কাজ হলো। হায়েনা অস্ট্রিচের বন্ধুত্ব আর থাকল না।

সেই দিন থেকে দু'জনার বন্ধুত্বের বাঁধন গেল ছিড়ে।

কোনোদিনই আর জোড়া লাগল না তা। ❑

গল্পকার

হেমন্তের ধান

সাদিয়া ইসলাম কথা

হেমন্তের ধান
ঘরে ঘরে আনন্দের বাণ
ধান কাটে চাষি
রাখাল বাজায় বাঁশি

নতুন চালের পিঠা
খেতে লাগে মিঠা

নবান্নের গন্ধে
ভরে থাকে সন্ধ্যে।

দশম শ্রেণি, কামরুননেসা হাই স্কুল, টিকাটুলি

পিঠা-পুলি

জাওয়াদ আলম

নতুন ধানে পিঠা-পুলি
খেতে মজা ভারি
বাড়ির ছোটো-বড়ো সকলের
তাই নিয়ে চলে কাড়াকাড়ি।

এ সময়ে আত্মীয় আসে
মজার সব পিঠা-পুলি খেতে
নবান্নে গ্রামের মানুষ
উৎসবে উঠে মেতে।

অষ্টম শ্রেণি, মাভা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

হেমন্ত এসেছে

শাহরিয়ার বিনতে সাবাব

হেমন্ত এসেছে
হিম হিম আবেশে
শিশিরের ছোঁয়ায়
পাতা ঝরার শব্দে
ধান কাটার আনন্দে
নবান্নের ঘ্রাণে
লাউ গাছের ডগায়
বুলবুলির নাচনে
জলাশয় ভরে উঠে
অতিথি পাখির আগমনে।

শাহরিয়ার বিনতে সাবাব, দ্বাদশ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

বসুন্ধরার রূপ

আবু আহাদ

ঘাসের ডগায় শিশির হাসে
মনে হয় মুক্তো সাজে।
গুনগুনিয়ে সুর বাজে
আনন্দের বাণ সবার মাঝে।
ডানা মেলে অতিথি পাখি
সন্ধ্যে হলে ডাকাডাকি।
বিলের জলে শাপলা ভাসে
পালা গানের আসর বসে।
ধনধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা।

স্নাতক ১ম বর্ষ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা

প্রশান্তি

লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

পরীক্ষাটা শেষ
লাগছে অনেক বেশ,
সারা বছর ক্লান্তির পর
শেষ হবে এর রেশ।

নিজ নিজ সাধ্যে
ভূ-সৌন্দর্যের মধ্যে
ঘুরে আসতে পারি সবাই
নিসর্গের সান্নিধ্যে।

ঐতিহাসিক স্থান কিংবা
সমুদ্রের তীরে
ছুটিটাকে কাজে লাগিয়ে
আসতে পারি ঘুরে।

তবে, এক ছুটিতে ভেদ হবে না
আকাশ-পাতাল পুরী
তবু সবার করা উচিত
একটু ঘোরাঘুরি।

নবম শ্রেণি, হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

bZb bv‡gi †`k¸‡jv

এটিএম মোস্তফা কামাল

একটি দেশের নাম বদল করা সহজ নয়। তবুও বিশ্বে গত ৮৮ বছরে ১১টি দেশ নিজেদের দেশের নাম বদল করেছে। এসব নাম বদলের কারণে রয়েছে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক নানা প্রেক্ষাপট। সরকারের উচ্চপর্যায়ের আলোচনা, ঐকমত্য ও বিভিন্ন মতামতের সমন্বয়ে পরিবর্তিত হয় একটি দেশের নাম। রয়েছে আরো অনেক জটিলতাও। ছোট্ট বন্ধুরা চলো জেনে নিই নাম বদলে যাওয়া দেশগুলো সম্পর্কে।

বাংলাদেশ : ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিজয় ছিনিয়ে এনে স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতার পর নাম রাখা হয় 'বাংলাদেশ'। নাম এবং অবস্থার পরিবর্তন দুটি অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভাষা এবং রাজনৈতিক পার্থক্যকে প্রতিফলিত করে।

ভারত : সম্প্রতি ভারত 'প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া' বদলে 'প্রেসিডেন্ট অব ভারত' নামকরণ করে। ফলে নাম পরিবর্তনের বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর লোকসভার বিশেষ অধিবেশনে ভারতের নতুন নামকরণের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শ্রীলংকা : শ্রীলংকার আগের নাম সিলন। ১৯৭২ সালে এই দ্বীপদেশটি নাম পরিবর্তন করে সিলন থেকে শ্রীলংকা রাখে। সিংহলি ভাষা থেকে আগত এ শব্দ দেশটিকে মূলত 'প্রজাতন্ত্র' উপস্থাপন করে। নাম পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরা। এছাড়াও আরো একটি কারণ ছিল, ব্রিটিশ শাসনের ঔপনিবেশিক অতীতকে মুছে ফেলা। শ্রীলংকা

মানে সিংহলি ভাষায় 'আলোকিত ভূমি' যা দেশটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরার ওপর জোর দেয়া হয়।

মিয়ানমার : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ 'মিয়ানমার'-এর পূর্ব নাম 'বার্মা' । ১৯৮৯ সালে জান্তা সরকার এ নাম রাখে। নাম পরিবর্তনে আন্তর্জাতিক বিতর্ক এবং বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ নামটি ক্ষমতাকে বৈধ করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

থাইল্যান্ড : থাইল্যান্ডের আগের নাম 'সিয়াম'। ১৯৩৯ সালে 'সিয়াম' থেকে থাইল্যান্ড হয়। 'থাইল্যান্ড' শব্দের অর্থ 'স্বাধীনতার দেশ'। স্বাধীন দেশ নিয়ে থাই জনগণের গর্ববোধের জায়গা থেকে এ নামটি বেছে নেওয়া হয়। পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমা ঔপনিবেশিক দাপটের মুখে জাতির ঐক্য ও পরিচয় নিশ্চিত করা।

ইরান : নাম বদলের তালিকায় প্রথম দেশ হলো ইরান। ১৯৩৫ সালের ২১ শে মার্চ ফার্সি নববর্ষে রেজা শাহ নাম বদলের ঘোষণা দেন। আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের নাম 'পারস্য' থেকে 'ইরান' রাখা হয়। তার মতে, 'পারস্য' নামটি ঔপনিবেশিক, প্রাচ্য এবং সেকেলে। নামটি যেন অতীতের কথা বলে, ভবিষ্যতের কথা নয়। রেজা শাহ ছিলেন আবেগপ্রবণ এবং দূরদর্শী সংস্কারক।

চেক প্রজাতন্ত্র এবং স্লোভাকিয়া : ১৯৯৩ সালে চেকোস্লোভাকিয়া দেশটির বিলুপ্তির পর দুটি পৃথক দেশ তৈরি হয়। একটি হলো চেক প্রজাতন্ত্র এবং অন্যটি স্লোভাকিয়া। এই শান্তিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা কমিউনিস্ট শাসনের ইতি ঘটায়। দুটি জাতিগোষ্ঠী, চেক এবং স্লোভাকদের মধ্যে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা নিরসনের বিষয়টি তুলে ধরে এ নাম রাখা হয়।

চেকিয়া : কোম্পানি এবং ক্রীড়া ইভেন্টগুলোর জন্য দেশের সুবিধার্থে ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে চেক প্রজাতন্ত্রকে চেকিয়া নামে পরিবর্তন করা হয়। ২০ বছর নানা আলোচনার পর এ নামটি চূড়ান্ত করে।

এসওয়াতিনি : ২০১৮ সালের এপ্রিলে আফ্রিকান দেশ সোয়াজিল্যান্ডের রাজা দেশটির নাম পরিবর্তন করে এসওয়াতিনি নাম ঘোষণা দেন। আগের নামটি 'সুইজারল্যান্ডের' সাথে মিল থাকায় অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করত। নতুন এসওয়াতিনি নামটি সবাই স্বাগত জানিয়েছে।

তুর্কি : তুর্কির আগের নাম ছিল তুরস্ক। ২০২১ সালে এ নামটি পরিবর্তন হয়েছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান দেশটির নাম পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছেন এবং দেশটিকে আন্তর্জাতিকভাবে তুর্কি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, এ সিদ্ধান্তটি জনসাধারণ এবং বিদেশি দেশগুলোর কাছে তাদের ভাবমূর্তি ইতিবাচকভাবে ফুটে উঠবে। 'তুর্কি' শব্দটি দেশের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে উপস্থাপন করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো : রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং সংঘর্ষের পর ১৯৯৭ সালে জায়ারের নাম পরিবর্তন করে ডেমোক্রেটিক 'রিপাবলিক অব কঙ্গো' রাখা হয়। পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বলা হয়, মোবুতু সেসে সেকোর কর্তৃত্ববাদী শাসন থেকে দূরে রাখা। কারণ তিনি ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্বৈরশাসক হিসেবে দেশটিকে শাসন করেছিলেন। নতুন নামটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ফিরে আসার ওপর জোর দিয়েছে।

উত্তর ম্যাসেডোনিয়া প্রজাতন্ত্র : ২০১৯ সালে ম্যাসেডোনিয়া দেশটি উত্তর মেসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্র নামে নামকরণ করা হয়। নামের পরিবর্তনের ফলে গ্রিসের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের অবসান ঘটে। এছাড়াও এটি একটি কূটনৈতিক চুক্তির অংশ, যা উত্তর মেসিডোনিয়ার ন্যাটো সদস্যপদ লাভে সহজ করেছিল এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নতি হয়। ❑

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট

সম্পাদক, দি ভয়েস অব এশিয়া ও নাগরিক সংবাদ

জেনে নাও কিছু

শরীফ উদ্দিন

প্রথম রেল স্টেশন

কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুষ্টিয়ার জগতি স্টেশন। এটিই বাংলাদেশের প্রথম রেল স্টেশন। ব্রিটিশ আমলে কলকাতার শিয়ালদহ থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত যাতায়াতে ১৮৬২ সালে এ স্টেশনটি চালু করা হয়। ১৮৪৪ সালে আর. এম স্টিফেনসন কলকাতার কাছে হাওড়া থেকে পশ্চিম বাংলার কয়লাখনি সমৃদ্ধ রানীগঞ্জ শহর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি গঠন করেন। এ কোম্পানি ১৮৫৪ সালে হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ৩৮ কিলোমিটার রেললাইন চালু করে। এরপর ১৮৬২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কলকাতা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত রেলপথ চালু করে। ওই বছরের ১৫ই নভেম্বর কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত ৫৩.১১ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেললাইন শাখা উন্মোচন করা হয়। সে সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ববঙ্গের প্রথম রেলওয়ে স্টেশন জগতি। পরে ঢাকার সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করতে ১৮৭১ সালের ১লা জানুয়ারি জগতি থেকে বর্তমান রাজবাড়ী জেলার পদ্মা নদী তীরবর্তী গোয়ালন্দঘাট পর্যন্ত রেললাইন চালু করা হয়। সে সময় মানুষ কলকাতা থেকে ট্রেন করে জগতি স্টেশন হয়ে গোয়ালন্দঘাটে যেতেন। সেখান থেকে স্টিমারে পদ্মা নদী পেরিয়ে ঢাকা পৌঁছাতেন। সেই থেকে কালের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে দেশের প্রথম রেলওয়ে স্টেশন জগতি।

বাংলাদেশ রেলওয়ে জাদুঘর

জাদুঘরটি চট্টগ্রামের পাহাড়তলী থানার অন্তর্গত আমবাগানের বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যারেজ ও ওয়াগন কারখানার সম্মুখে প্রায় ১২ একর পাহাড়ি এলাকা জুড়ে অবস্থিত। জাদুঘরটি ৪২০০ বর্গফুটের কাঠের তৈরি দোতালা বাংলো। এটি

১৫ই নভেম্বর ২০০৩ সালে দেশের একমাত্র রেলওয়ে জাদুঘরে পরিণত হবার পূর্ব পর্যন্ত রেলওয়ের বাংলো হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ২০১৬ সালে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জাদুঘরটির সংস্কার কাজ শুরু করে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ববর্তী সংস্থা আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে (১৯৪২), ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে (১৯৪৭) এবং পাকিস্তান রেলওয়ের (১৯৬১) ব্যবহৃত বিভিন্ন নিদর্শন এবং বস্তুর সমৃদ্ধ সংগ্রহ রয়েছে এ জাদুঘর। সংরক্ষিত শিল্পকর্মগুলো প্রধানত বাংলাদেশ রেলওয়ের যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক, টেলিযোগাযোগ, সংকেত, ট্রাফিক ও প্রকৌশল বিভাগের অন্তর্গত। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বাতি ও আলো, ঘণ্টা, স্টেশন মাস্টারের পোশাক এবং আনুষাঙ্গিক, সিগন্যাল সরঞ্জাম, ট্রান্সমিটার, অ্যানালগ টেলিফোন, মনোগ্রাম, ট্র্যাক সুইচ এবং রেলওয়ে স্লিপার রয়েছে জাদুঘরটির সংরক্ষণে।

রেলের কেবিন ঘর

আগে এই ঘর থেকে হাতে লিভার টেনে ট্রেনের লাইন চেঞ্জ করা হতো। সাধারণত স্টেশনের আগে বা পরে অথবা উভয় দিকে থাকত এ কেবিন ঘর। ট্রেন প্লাটফর্মে ঢোকার বা বের হওয়ার পর কোন লাইনে যাবে সেটা নির্ধারণ করার জন্য সেই ব্রিটিশ আমল থেকে ম্যানুয়াল সিগন্যাল ব্যবহার করা হতো। এখন এগুলো পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এখন সরাসরি স্টেশনের কন্ট্রোল রুম থেকেই এই কাজটি করা হয় ডিজিটাল পদ্ধতিতে।

আগে যে সিগনাল পোলগুলো ব্যবহার করা হতো সেগুলোতে কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। সন্ধ্যা হলে কুপি বাতি জ্বালিয়ে বক্সের ভিতরে দিয়ে দেয়া হতো। পরে কেবিন থেকে লিভার টেনে সিগনালটা লাল/হলুদ করা হতো। এখন বৈদ্যুতিক পোল হওয়ায় স্টেশন থেকেই সব হয়। আগে বিভিন্ন স্টেশনের আশপাশে রেললাইনের পাশে যে তার দেখা যেত তা মূলত এই ম্যানুয়াল সিগনালের সংযোগ।

রেলগাড়ির হুইসেল

ট্রেনে মোট ৯ ধরনের হুইসেল দেয়া হয়। এর প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদা অর্থ ও কাজ রয়েছে। ট্রেনের ইঞ্জিনের হুইসেলের সংখ্যা ও স্থায়িত্ব রেলওয়ে কর্মীদের বিভিন্ন সংকেত দেয়। এসো জেনে নিই ট্রেনের কোন সিগন্যালের কি কাজ-

- লম্বা একটা হুইসেল–ইঞ্জিন যাত্রা করছে
- দুটি লম্বা হুইসেল–রেললাইনের খোয়া বা ব্যালাস্ট পরিবহণের ট্রেন চালুর পূর্বে দেওয়া হয়
- চারটি ছোটো হুইসেল–ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে
- তিনটি লম্বা হুইসেল–ট্রেনের গার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ
- একটি ছোটো ও একটি লম্বা হুইসেল–ট্রেনের ইঞ্জিন বা কোচ আলাদা করা হবে
- দুটি ছোটো একটি লম্বা হুইসেল–ট্রেনের চেইন টানা হয়েছে সেটা জানানো হয় গার্ডকে
- তিন বা ততধিক ছোটো হুইসেল–গার্ডের থেকে ব্রেক প্রেসারের সংকেত পাওয়ার জন্য এই হর্ন
- ঘন ঘন হুইসেল–সামনের পথ দেখা যাচ্ছে না অথবা বাঁক নিচ্ছে ট্রেন অথবা দুর্ঘটনা কবলিত এলাকা পার হওয়ার সংকেত
- ছয়টি তীক্ষ্ণ ও ছোটো হুইসেল–ক্রসিং পরিষ্কার দেখা না গেলে এভাবে হর্ন দেওয়া হয়। ❑

প্রাবন্ধিক

A‡÷wjqvi wek Rq

ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩ ফাইনালে মুখোমুখি হয় ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় স্কোরবোর্ডে বড়ো রানের পুঁজি তুলতে পারেনি ভারত। ১৯শে নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে নির্ধারিত ৫০ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ভারত ২৪০ রান সংগ্রহ করে। মাঝারি এই লক্ষ্য দিয়েও শুরুতে অস্ট্রেলিয়াকে চেপে ধরে ভারত। পাওয়ার প্লেতেই তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়ার তিন উইকেট ৪৭ রানে। কিন্তু ভারতের স্বপ্নের চূড়ায় উঠার গল্প এইটুকুই। পরেরটা লিখেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার ট্রাভিস হেড। যোগ্য সঙ্গী হিসেবে পান মার্নাস লাবুশেনকে। ভারতের হৃদয় ভাঙা অসাধারণ এক সেঞ্চুরি তুলে জয়ের থেকে মাত্র দুই রান দূরে থাকতে আউট হন এই ওপেনার। এর ফলে ৪২ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে ভারতকে হারিয়ে আরো একবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া।

এদিন চেনা রূপে শুরু করেছিলেন ব্যাটার হেড। ইনিংসের শুরুতেই ওয়ার্নার আউট হয়ে গেলে দেখেশুনে খেলেন তিনি। এরপর মিচেল মার্শ ও স্টিভ স্মিথের দ্রুত বিদায়ে কোণঠাসা হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। ট্রাভিস হেড ধীরে ধীরে খোলস খুলে শেষ পর্যন্ত ১২০ বলে ১৩৭ রান করে মোহাম্মদ সিরাজের শিকার হন। ১৫টি চার ও ৪টি ছক্কায় সাজান নিজের ইনিংস। পেয়ে যান ম্যাচসেরার পুরস্কার। তার সঙ্গে দারুণ খেলেছেন লাবুশেনও। হেডের সঙ্গে ২১৫ বলে ১৯২ রানের জুটি গড়েন। শেষ পর্যন্ত ১১০ বলে ৫৮ রানে অপরাজিত থাকেন এই ব্যাটার। ভারতের পক্ষে ৯ ওভার বল করে ৪৩ রানে ২টি উইকেট পান জাসপ্রিত বুমরাহ। একটি করে উইকেট নেন মোহাম্মদ শামি ও মোহাম্মদ সিরাজ।

অস্ট্রেলিয়া সর্বশেষ ৬টি বিশ্বকাপের ৪টিতে চ্যাম্পিয়ন, একবার সেমিফাইনাল, একবার কোয়ার্টার ফাইনাল। বিশ্বকাপের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সফলতম দলও তারা। ২০১৫ সালে যখন প্রতিবেশী নিউজিল্যান্ডের হৃদয় ভেঙে মেলবোর্নের ফাইনাল জিতেছিল মাইকেল ক্লার্কের দল, তখনো বলা হয়েছিল নিজেদের সম্পত্তিটাই ফিরে পেল অস্ট্রেলিয়া। ১৯৯৯, ২০০৩, ২০০৭ টানা তিন আসরে বিশ্বকাপ জয়ী দলও এই অস্ট্রেলিয়া। অন্য কোনো দেশ টানা তিনবার সেটি ছুঁয়ে দেখারও সুযোগ পায়নি। ❑

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

আর্ক এশিয়ায় রৌপ্য জয়

ফিলিপাইনের বোরাকা উপদ্বীপে সম্প্রতি এশিয়ার ২২টি দেশ থেকে স্থপতিদের সংগঠন 'ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস' নিয়ে আয়োজিত হয় এক মিলনমেলা। ২০তম এ আয়োজনকে আর্কিটেক্টস রিজিওনাল কাউন্সিল এশিয়া যার সংক্ষিপ্ত রূপ আর্ক এশিয়া শিরোনামে নামকরণ করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব আর্কিটেক্টস প্রতি বছর স্থাপত্য সংক্রান্ত নানারকম প্রতিযোগিতা ও সেমিনার আয়োজন করে। এবারের আয়োজনে বছরের সেরা গবেষণা বিভাগে রৌপ্যপদক অর্জন করেছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ফাহিম আসহাব ফারুকী। ফাহিমের গবেষণার শিরোনাম 'ইকোজ অব রিপ্লেনিশমেন্ট', যার অর্থ পরিপূরণের প্রতিধ্বনি। পদ্মা সেতু স্থাপনার জন্য নির্বাচিত এলাকাটি সেতু নির্মাণের পর কার্যকরভাবে ব্যবহার করাই ছিল গবেষণার মূল বিষয়। ফাহিম গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছিল মাওয়া অংশের ২১.৪ একর জায়গা এবং সেতুর স্প্যান শেডের ক্ষেত্রফল ৬.০১ একর।

সেতুর স্থাপত্য শেডকে পুনরুদ্ধার করা, জায়গাটিতে নতুনভাবে কাজে লাগানোর পাশাপাশি নদী-বিস্তৃত সেতুর চিত্তাকর্ষক গল্প তুলে ধরার লক্ষ্যে সেখানে জাদুঘর তৈরির নকশা করেছে ফাহিম। জাদুঘরের কমপ্লেক্সকে আশপাশের দৃশ্যের সঙ্গে মিল রেখে একটি চিত্তাকর্ষক পরিবেশ ও পার্ক ডিজাইন করে। যেখানে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল এবং দর্শক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত থাকবে। আগত দর্শকদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আরও সুন্দর করতে বাইরে বিশ্রাম, বিনোদন এবং জনসমাবেশমূলক কাজে অংশ নিতে পারবে। মূল আকর্ষণ হিসেবে থাকবে পাবলিক প্লাজা, যা বিভিন্ন অনুষ্ঠান কিংবা জনসমাগমের জন্য একটি স্থান হিসেবে কাজ করবে। দর্শনার্থীদের জন্য সুবিধা এবং প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত পার্কিং এবং ড্রপ-অফ এলাকাও ভূ-নির্মাণ পরিকল্পনাতে সংযুক্ত করেছে।

পদ্মা নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নদীর সমৃদ্ধ জলজীবনকে দৃষ্টিগোচর করতে জাদুঘরটিতে বিভিন্ন রকম প্রদর্শনী, অ্যাকুয়ারিয়াম এবং নিমজ্জিত স্থাপনা ব্যবহার করেছে। এছাড়া জাদুঘরটিতে আকর্ষণীয় নৌকা প্রদর্শনীও থাকবে; যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক এবং পুরনো নৌকা, নদী-জীবনের সংস্কৃতি এবং লোককাহিনির গ্যালারি, নদীর ইতিহাস এবং বিশ্ববিখ্যাত নদী সেতুগুলোও বিদ্যমান।

পদ্মা সেতু জাদুঘরটির পদ্মা সেতু গ্যালারিতে একটি উন্মুক্ত পরিদর্শন ডেক থাকবে; যা থেকে সেতুটির একটি রাজকীয় দৃশ্য অবলোকন করা যাবে। ফাহিম একই সাথে ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি) এবং চুয়েটেরও প্রতিনিধিত্ব করেন। এই গবেষণা প্রকল্পের যৌথভাবে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন চুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা তাসনিম এবং ইউনিভার্সিটি এশিয়া প্যাসিফিকের সহযোগী অধ্যাপক জিয়াউল ইসলাম। উল্লেখ্য, একই প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্রী ইসরাত জাহান। ❑

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

হাতি বাংলো

দূর থেকে দেখলে মনে হবে পাহাড় চূড়ায় শুঁড় তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক হাতি। তবে কাছে গেলেই ভুল ভাঙবে। দেখতে হাতির মতো হলেও সেটি ইট-পাথরের তৈরি একটি বাংলো। হাতির মতো নির্মাণ করায় এই বাংলোর নাম 'হাতি বাংলো'। চট্টগ্রাম নগরীর সিআরবি জায়গাটি এমনিতেই সুন্দর, আরও মনোমুগ্ধকর করেছে হাতি বাংলোটি।

রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের মালিকানাধীন স্থাপনাটিতে হাতির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে ছাই রঙের প্রলেপ। এ কারণে নতুন পর্যটকরা প্রথমে বাংলোটিকে দূর থেকে দেখে জীবন্ত হাতি ভেবে চমকে ওঠেন।

এর দু'পাশে দুটি করে চারটি জানালা রয়েছে। সামনে ও পেছনে তিনটি করে রয়েছে ছয়টি জানালা। সামনে শুঁড়ের অবয়বের দিকে একটি করে দুটি গোলাকার জানালা রয়েছে। এগুলো দেখতে হাতির দাঁতের মতোই। শুঁড়ের সামান্য উপরের দিকে রয়েছে গোলাকার দুটি ছিদ্র। এগুলো দেখতে হাতির চোখের মতো। লম্বা করে বানানো শুঁড়ের নিচে রয়েছে বাংলোর ব্যালকনি। পেছনেও রয়েছে হাতির লেজের আকৃতি। দু'পাশের অংশেও হাতির মতো মস্ত বড়ো পেট শোভা পাচ্ছে। ভবনটির নিচ তলায় দুইটি এবং উপরে একটি কক্ষ রয়েছে। প্রকৌশলী ব্রাউনজার উত্তরমুখী এই বাংলোতে থাকতেন। পরবর্তীতে ডরমেটরি হিসেবে ব্যবহার হতো। পাহাড়ের উপর নির্মিত ভবনটির চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে। প্রকৃতি নিজের হাতেই ওই এলাকাকে যেন সাজিয়ে দিয়েছে।

বাংলোটির বয়স জানলে রীতিমতো হতবাক হতে হয়। রেলওয়ের একাধিক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে আলাপকালে জানা গেছে, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সদর দপ্তর ছিল চট্টগ্রামে। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বদিক এবং বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলসহ পুরো আসাম প্রদেশে রেললাইন স্থাপন করেছিল আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে। ১৮৯৩ সালে চট্টগ্রাম থেকে ফেনী পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণকাজ শুরু হয় ব্রিটিশ প্রকৌশলী ব্রাউনজারের অধীনে। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই বাংলোটি নির্মিত হয়। এ হিসেবে বর্তমানে এর বয়স ১২৮ বছর। এখনও বেশ শক্তপোক্ত স্থাপনাটি। সিআরবির ইতিহাস-ঐতিহ্যের অন্যতম একটি স্মারক স্থাপনা এটি। দৃষ্টিনন্দন এ বাংলো কালের বির্বতনে এখন বিবর্ণ, ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা জানিয়েছেন, হাতির বাংলোটি নির্মাণ করা হয়েছে 'ফেরো সিমেন্ট' দিয়ে। ফেরো সিমেন্ট হচ্ছে এক ধরনের সিমেন্ট ও কংক্রিটের মিশ্রণ। ১৯৪০ সালে পিএল নেরভি নামে ইতালির এক স্থপতি ফেরো সিমেন্ট আবিষ্কার করেন। ফলে শত বছর পার হলেও এখনও মজবুত তারজালি ও বালুর সঙ্গে এক ধরনের সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হাতির বাংলোটি। যে পাহাড়টিতে হাতির বাংলো রয়েছে, সেখানে যাওয়ার রাস্তাটির অবস্থা খুবই নাজুক। সিআরবিতে রয়েছে নানা প্রজাতির পাখি। পাহাড় চূড়ার বৃক্ষরাজি থেকে ভেসে আসা পাখির কলতান হাতি বাংলোর আগন্তুকদের মুগ্ধ করে। ❑

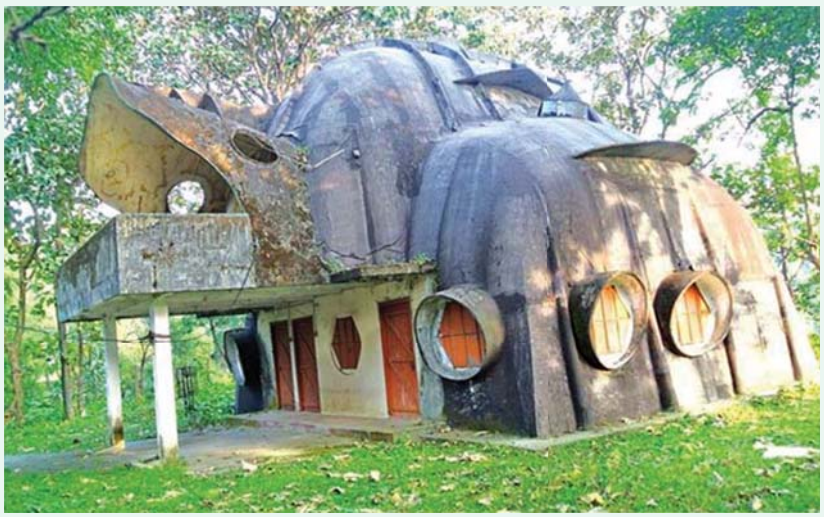

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

বিশ্বের প্রাচীনতম বইমেলা

আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও ছাপা বই নিয়ে উচ্ছ্বাসের কোনো কমতি নেই সারা পৃথিবীর বইপ্রেমীদের মধ্যে। তাই বইমেলার জন্য সারা বছরই এক ধরনের উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করেন বইপ্রেমীরা। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন বইমেলা সম্পর্কে জেনে নাও আজকের নিবন্ধে।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন, জনপ্রিয় ও বৃহৎ বইমেলা হলো ফ্রাঙ্কফুর্ট বুক ফেয়ার। প্রতিবছর মধ্য অক্টোবরে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের ট্রেড ফেয়ার গ্রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয় এই মেলা।

মেলা প্রদর্শিত হয় চার মিলিয়ন স্কয়ার ফুট জায়গা জুড়ে। এত বড়ো মেলায় নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে ম্যাপে খুঁজে নিতে হয় অথবা ট্যুর গাইডের সহায়তায় শিডিউল করা ইভেন্টে পৌঁছাতে হয়।

প্রকাশক এবং প্রকাশনা ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরাই এ মেলার আয়োজন করে থাকেন। মেলা চলে পাঁচ দিন ধরে। প্রথম তিন দিন নির্ধারিত থাকে বিভিন্ন দেশ থেকে অংশ নেওয়া প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের জন্য। শেষের দুই দিন উন্মুক্ত থাকে সর্বস্তরের জনগণের জন্য। মেলায় প্রায় দুই লাখের বেশি মানুষ আসেন বই কিনতে, বিক্রি করতে, শিখতে অথবা শুধু উদ্বুদ্ধ হতে। বইয়ের জগতে যুক্ত যে-কোনো ব্যক্তির জন্যই এই মেলা গুরুত্বপূর্ণ।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা সেই ১৭ শতক থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ বিরতির শেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবারও ৩০০ বছর আগের ফ্রাঙ্কফুর্টের বইকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ফিরে আসতে শুরু করে। ১৯৪৯ সালের ১৮-২৩ সেপ্টেম্বর ফ্রাঙ্কফুর্টের পাউল গির্জায় ২০৫টি প্রকাশনার ৮৪৪টি বই প্রদর্শনের মাধ্যমে বইমেলার যাত্রা শুরু হয়।

এরপর থেকে মেলাটি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ মেলা শুধু বইপ্রিয়দের জন্য মূল ইভেন্ট নয়, বই বিক্রেতাদের জন্যও প্রচারের অন্যতম জায়গা। বই বিক্রির পরিবর্তে বই প্রকাশনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রকাশনা আইন, লাইসেন্স ফি এবং ট্রেডিংয়ের কাজও করে মেলা কর্তৃপক্ষ। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা বাংলাদেশের জন্য একটি বিশেষ মেলা। ২০১৫ সাল থেকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ফ্রাঙ্কফুর্টের আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করছে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের প্যাভিলিয়ন ছিল বইমেলায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন লেখকের প্রায় ৫০০ বাংলা ও ইংরেজি বই প্রদর্শন করা হয় মেলায়।

প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন অতিথি মেলার মূল আলোচনায় থাকেন। ১৯৭৬ সাল থেকে প্রতি বছর মেলা কর্তৃক কোনো একটি দেশকে 'গেস্ট অব অনার' খেতাব দেওয়া হয়। ২০১৮ সালে জর্জিয়ান সাহিত্য এ খেতাব অর্জন করে। ২০১৯ সালে নরওয়েজিয়ান সাহিত্য এই খেতাব পায়। ২০২০ সালে এ তালিকায় যুক্ত হয় কানাডা। এবারের মেলায় অতিথি দেশ হিসেবে ছিল স্লোভেনিয়া। অতিথি দেশ স্লোভেনিয়া ৭৫ জন লেখক, অনুবাদক এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মী নিয়ে মেলা উপলক্ষে ফ্রাঙ্কফুর্টে এসেছিল।

এই ইভেন্টে বই পড়া, আত্ম-প্রকাশনা, কসপ্লে (প্রিয় সিনেমা, বই অথবা ভিডিও গেইমের কোনো চরিত্রের মতো সাজা অথবা পোশাক পরা), কবিতা পড়া, মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলা, রান্নার বিভিন্ন বই নিয়ে সাজানো গ্যালারিসহ আর নানা বিষয় উপস্থিত থাকে। ১৯৫০ সাল থেকে 'পিস প্রাইজ অব দ্য জার্মান বুক ট্রেড'সহ বেশ কয়েকটি অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার রীতিও আছে বইমেলায়। শান্তি ও সহমর্মিতা বজায় রাখেন যে লেখকরা তারাই এ পুরস্কার পান। ❑

প্রতিবেদন: রওশন আরা জাহান

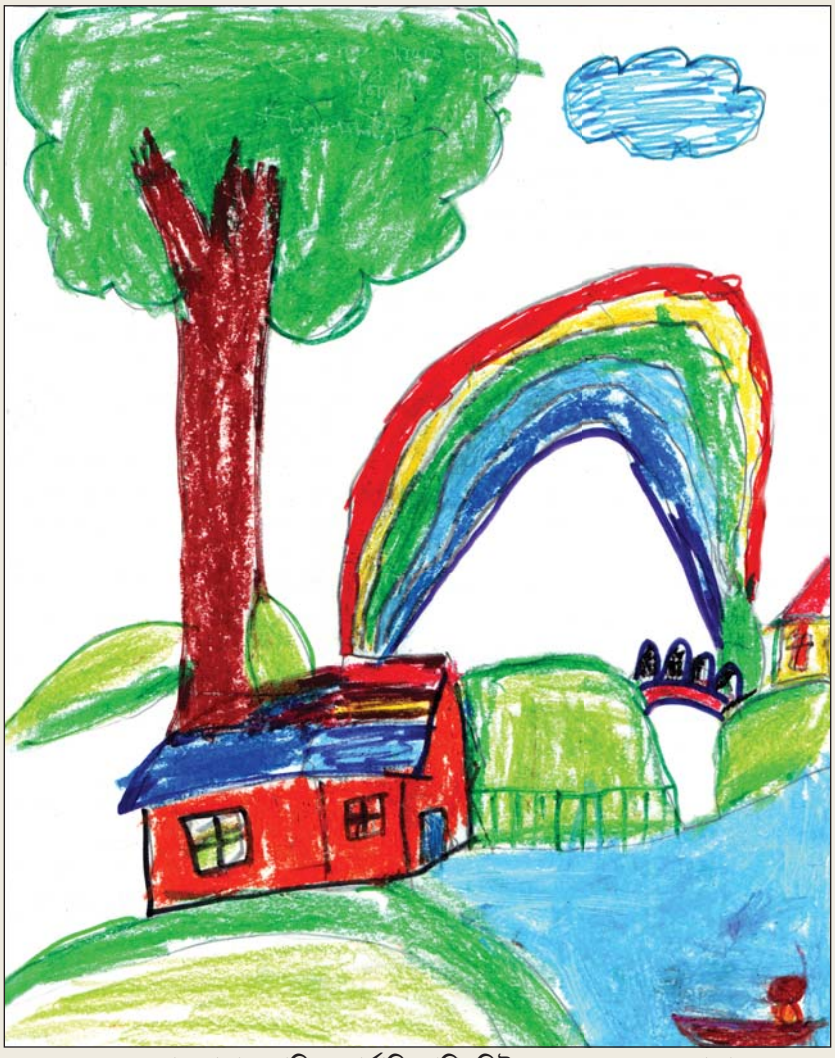

মেহরাব হাসান জারিফ, নার্সারি শ্রেণি, লিটল এনজেলস স্কুল, ঢাকা

প্রতীকী দায়িত্ব পালন

গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে প্রতীকী দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেলেন ঢাকার উপকণ্ঠ থেকে কিশোরী মালেকা। ১৮ ই অক্টোবর একদিনের জন্য গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির আজমানের পদে দায়িত্ব পালন করে সে।

একদিনের জন্য উঠে আসা ১৭ বছর বয়সি গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী ইয়াসির আজমানের পদে প্রতীকী দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে দেশের হাজারো কিশোরী ও তরুণীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠেন মালেকা।

এ আয়োজনের অংশ হিসেবে গ্রামীণফোনের প্রধান কার্যালয় জিপি হাউজে এক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির সিইও হিসেবে প্রতীকী দায়িত্ব পালন করে কিশোরী মালেকা। অনুষ্ঠানে গ্রামীণফোনের সিইও ইয়াসির আজমান মালেকাকে স্বাগত জানান এবং গ্রামীণফোনের সিনিয়র লিডারশিপ টিমের অংশ করে নেন। পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ খাত সম্পর্কে গভীরভাবে জানা, প্রযুক্তি বিশ্বে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণফোন কীভাবে কাজ করে তা বোঝা এবং গ্রামীণফোনের প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা (সিএইচআরও) সৈয়দা তাহিয়া হোসেনের কাছ থেকে ক্যারিয়ারে সাফল্য অর্জনে পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ পায় মালেকা।

অনুষ্ঠানে গ্রামীণফোনের সিইও ইয়াসির আজমান বলেন, 'আমাদের অংশীদার প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় গার্লস টেকওভার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতাটি দারুণ ছিল। আমরা বিশ্বাস করি, লৈঙ্গিক পরিচয় কখন সাফল্যের পথে বাধা হওয়া উচিত নয়। এ ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করার ক্ষেত্রে আমরা ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। যাতে নারীরা এগিয়ে যেতে পারেন।'

গ্রামীণফোনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত মালেকা বলে, 'নতুন এ দায়িত্ব গ্রহণের অভিজ্ঞতা আমার আত্মবিশ্বাস এবং জ্ঞান বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি আমার কমিউনিটির অন্য মেয়েদের আমার অভিজ্ঞতা এবং কী শিখলাম তা জানাব, যাতে তারাও সমাজের শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধরে রাখে। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ও গ্রামীণফোনের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত এই অনন্য অভিজ্ঞতার অংশ হতে পেরে আমি আনন্দিত এবং সম্মানিত।'

উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন উদ্ভাবনী সমাধানের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে গ্রামীণফোন। একটি কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম পরিচালনা করে- কার্যকরী পরিকল্পনায় গুরুত্বারোপ করে, বিস্তৃতভাবে নারী কর্মী নিয়োগ দেয়; পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠানটি সম্ভাবনায় নারী কর্মীদের বিকাশে নেক্ট বিজনেস লিডারস, প্ল্যাটফর্ম শি এবং জিপি অ্যাকাডেমির মতো প্রোগ্রাম আয়োজন করে। ❑

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

কালাজ্বর নির্মূলে বাংলাদেশের সাফল্য

কালাজ্বর (Visceral leishmaniasis) বা Black fever একটি পরজীবী ঘটিত দীর্ঘস্থায়ী ও প্রাণঘাতী রোগ। যা লেইসম্যানিয়া ডনোভানী (Leishmania donovani) নামক এক প্রকার প্রোটোজোয়া পরজীবীর সংক্রমণের মাধ্যমে ছড়ায় এবং বেলেমাছির কামড়ের সাহায্যে এটি বিস্তার লাভ করে। প্রথমে এটি মানুষের রক্তের ম্যাক্রোফেজ দ্বারা বাহিত হয়ে অন্ত্রে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে লিভার, প্লীহা ও অস্থিমজ্জা আক্রান্ত করে বংশবৃদ্ধি করে।

এ রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশের পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে ২ মাস থেকে ৬ মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। ম্যালেরিয়ার পরে এটিই পরজীবী ঘটিত রোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী। সময়মতো এবং সঠিকভাবে চিকিৎসা না করলে কালাজ্বরে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এই রোগের লক্ষণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বিষণ্নতা বা অবসাদ, জ্বর, ওজন হ্রাস পাওয়া, শরীরে ক্ষত, চামড়া কালচে হওয়া, কলিজা ও প্লীহার আকার বৃদ্ধি, রক্তস্বল্পতা ইত্যাদি। সাধারণত গ্রামীণ এলাকায় কালাজ্বর একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা।

কালাজ্বর সাধারণত বেলেমাছির কামড়ে ছড়ায়। বেলে মাছি ঘর এবং ঘরের আশপাশের ফাটলে বিশেষ করে স্যাঁতস্যাঁতে এবং আর্দ্র মেঝে, দেয়াল, কাঠের আসবাবপত্রের ফাটল, উইপোকার গর্ত, ভাঙা ইট পাথরের নিচে এবং ঘরের আশপাশের ঝোঁপঝাড়ের ভিতর দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে। এরা সাধারণত সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত সময়ে বেশি কামড়ে থাকে। কেবলমাত্র স্ত্রী জাতীয় বেলেমাছি এ রোগ ছড়ায়। স্ত্রী জাতীয় বেলেমাছি এদের ডিমের পরিপক্বতার জন্য পশুপাখি এবং মানুষের রক্ত গ্রহণ করে থাকে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক জানিয়েছেন, কালাজ্বর নির্মূলে বিশ্বে বাংলাদেশকে প্রথম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। ৩১শে অক্টোবর ভারতের দিল্লিতে তিন দিনব্যাপী চলা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সম্মেলনে এ স্বীকৃতির সনদপত্র দেওয়া হয়।

স্বীকৃতির সনদপত্রটি তুলে দেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পুনম খেত্রপাল এবং এটি গ্রহণ করেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. টেড্রোস আধানম গেব্রিয়েসুস।

জাহিদ মালেক বলেন, এর আগে বাংলাদেশ ফাইলেরিয়া ও পোলিও নির্মূল করে সনদ পেয়েছিল।

তিনি বলেন, এবার বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে কালাজ্বর নির্মূলে বিশ্বে প্রথম হওয়ায় এটি জাতিগত প্রশংসা অর্জন করেছে। এ অর্জনে দেশের স্বাস্থ্যখাতসহ আমরা সকলেই গর্বিত। ❑

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

বুদ্ধিতে এগিয়ে ১২ বছরের শিশু

ছোট্ট বন্ধু কেভিন সুইনি। বয়স মাত্র ১২ বছর। এই ছেলের বুদ্ধি নাকি আলবার্ট আইনস্টাইন ও স্টিফেন হকিংয়ের মতো বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীদের বুদ্ধিকেও হার মানায়! মেনসা ইন্টারন্যাশনাল আইকিউ টেস্টের ফলাফল হতে জানা গিয়েছিল, ছোট্ট এই শিশুর আইকিউ লেভেল ১৬২! যেখানে বিশ্বের অন্যতম বুদ্ধিমান মানব আইনস্টাইনের আইকিউ লেভেল ছিল ১৬০। এমনকি পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং এর আইকিউও ছিল ১৬০। বিশ্বের মাত্র এক শতাংশ মানুষ এমন আইকিউসম্পন্ন হয়। এর আগে এমন আইকিউসম্পন্ন সফল ব্যক্তিরা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। কেভিন সুইনি একমাত্র কমবয়সি বুদ্ধিমান শিশু যিনি পূর্বের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে সর্বোচ্চ আইকিউয়ের অধিকারী হলেন। স্কটল্যান্ডের লাচজেলির বাসিন্দা তিনি। তবে জন্মগতভাবে অটিজমে আক্রান্ত কেভিন। শারীরিকভাবে কিছুটা অক্ষম হলেও তার বুদ্ধির প্রতিভা দুর্দান্ত। নিজের বয়সি অন্যান্য বাচ্চাদের চেয়ে বুদ্ধিতে অনেক এগিয়েছিলেন কেভিন। ছয় বছর বয়সেই তিনি পর্যায় সারণি মুখস্ত করে ফেলেছিলেন। যে সারণি মুখস্ত করতে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বেশ হিমশিম খেতে হয়। কেভিনের বাবা-মা সব সময় তাকে নিয়ে আশাবাদী ছিলেন। তারা সব সময় তাকে সকল কাজে উৎসাহ দিতেন এবং অনুপ্রেরণা যোগাতেন। গত বছর এডেনবার্গের কোয়েকার মিটিং হাউজে অনুষ্ঠিত আইকিউ পরীক্ষাটিতে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছিলেন কেভিন। সেখানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একমাত্র কেভিনই ছিলেন শিশু। এ পরীক্ষা দিতে গিয়ে কেভিনকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। কেবিন তার প্রাপ্ত আইকিউ নাম্বার এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীর সকল প্রতিযোগীকে হারিয়ে দেয়। সাথে বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রতিভাবান দুজন ব্যক্তির চেয়ে বেশি স্কোর অর্জন করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

আশুগঞ্জের রোবটের বিশ্ব জয়

ইচ্ছাশক্তি মানুষের সবচেয়ে বড়ো শক্তি। সেটাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একদল স্কুল ছাত্র। কৃষিবিষয়ক রোবট বানিয়ে সারা ফেলেছেন তারা। আশুগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের এ সকল শিক্ষার্থীরা উদ্ভাবন করেছে রোবট। যে রোবটের সুনাম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে গিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের নামকরা ১৯টি দেশের ৪০৯টি দলের সঙ্গে রোবট প্রতিযোগিতা করে স্বর্ণপদক জিতেছে তারা। সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম বিশ্ব উদ্ভাবন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলাদেশের আশুগঞ্জের শিক্ষার্থীরা। জিতে নেয় স্বর্ণপদক। সগৌরবে বিশ্বের হাজারো মানুষের সামনে জাতীয় সংগীত গেয়ে দেশ এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের জানান দিয়ে আসেন এই শিক্ষার্থীরা। তাদের এ রোবট বীজ বপন থেকে শুরু করে জমিতে সেচ দেওয়া ছাড়াও ফসলের উপযুক্ত মাটি শনাক্ত করতে পারবে। স্বপ্নবোনা এই ছাত্ররা আরো বানিয়ে ফেলেন পশুসম্পদ পর্যবেক্ষণে সক্ষম ড্রোন। আর এই দুই উদ্ভাবনই তাদের পৌঁছে দিয়েছে সফলতার স্বর্ণশিখরে। আশুগঞ্জের এই কিশোর বিজ্ঞানীদের এমন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

মানবতার ফেরিওয়ালা

আমাদের দেশে রয়েছেন এমন একজন মানুষ যিনি মানবতার ফেরিওয়ালা খেতাবপ্রাপ্ত। নিজেকে হেলমেটের আড়ালে রেখে অসহায় মানুষের হাতে তুলে দেন নগদ টাকা কিংবা কোনো উপহার। সাহায্যের সময় একবারের জন্যও দেখা যায় না তার চেহারা। মানবতার এই ফেরিওয়ালার নাম ফিরোজ হাসান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবাই তাকে ফ্রি-মোশন ফিরোজ কিংবা ফিরোজ হাসান নামে চেনে। কোনো অসহায় মানুষের সামনে হঠাৎ করেই বাইক নিয়ে হাজির হন তিনি। তারপর সেই সুবিধাবঞ্চিত মানুষটির সাথে আন্তরিকতার সাথে কথা বলে তার অবস্থা সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করেন। এরপর বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত। এ পুরো ব্যাপারটা ভিডিও ধারণ করে শেয়ার করেন ফেসবুক ও ইউটিউবে। পথশিশু থেকে শুরু করে সমাজের গরিব - অসহায়দের কাছে ফিরোজ হাসান এখন স্বপ্নপূরণের নায়ক। এভাবে একের পর এক মানবিক কাজ করে অর্জন করেছেন তুমুল জনপ্রিয়তা। পর্দার আড়ালে থাকায় খুব কম মানুষই তার চেহারা দেখেছেন। তিনি মনে করেন, মানবতা নিয়ে কাজ করার জন্য ক্যামেরার সামনে আসা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গোপনে দান করা সবচেয়ে উত্তম। তার ভিডিও তৈরির উদ্দেশ্য লোক দেখানো নয় বরং মানবিক কাজে মানুষকে উৎসাহিত করা।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ন, ৫. লগিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকের সংক্ষিপ্ত রূপ, ৭. বাগান, ৮. হেমন্তের পরের ঋতু, ১০. হট্টগোল, ১২. এক ধরনের মাছ, ১৩. রসে পূর্ণ

উপর-নিচ: ১. নরওয়ের রাজধানী, ২. পর্তুগালের রাজধানী, ৩. লেখার উপাদান, ৪. বাংলাদেশের একটি নদী, ৬. এক ধরনের ঔষধি বৃক্ষ, ৭. বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী খেলা, ৯. বৃক্ষ ১১. কপাল

১.		২.		■	৩.	■	৪.
	■		■	■	৫.		
	■		■	৬.		■	
■	৭.			■	■	■	
■		■	■	৮.	৯.	■	
১০.			১১.	■	১২.		■
■		■		■	■	■	■
■	■	■	১৩.				■

ছক মিলাও

শব্দধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: হেমন্তকাল, অনন্তকাল, অনুসন্ধান, খামার, ছাগল, আতস, নলখাগড়া, লড়াকু, মান, কুমার

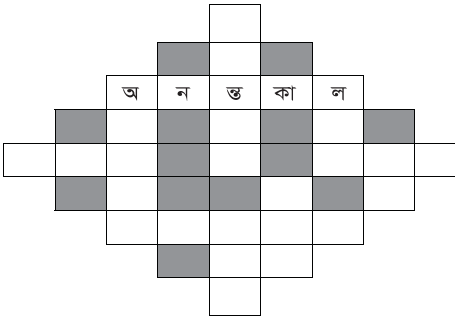

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৭৭		৭৫		৩৩	২০			১৭
	৮১		৩৫		২১		২৩	
৭৯		৭৩		৩১		২৯	২৪	
	৭১		৩৭		৩৯		২৫	
৬৯		৫৯		৪১	৪০		২৬	
	৬১		৫৭		৪৩	৮		
		৫৫		৪৯	৪৪		১০	১১
		৫৪		৪৮			৩	
৬৫	৬৪		৫২		৪৬	৫		১

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৫	*		-	৬	=	
+	■	-	■	-	■	-
	*	১	-		=	২
-	■	+	■	*	■	+
২	+		-	১	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	৫	-		=	৭

অক্টোবর মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

ই	ং	ল্যা	ন্ড		ক্ষ	ম	তা
লি					য়ি		
শ	তা	ব্দি			ষ্ণু		নৌ
	প						বি
	মা	প	কা	ঠি			হা
যা	ত্রা			ক	ম	জো	র
ত				ঠা			
না	খো	স		ক	ল	ক	জা

ছক মিলাও

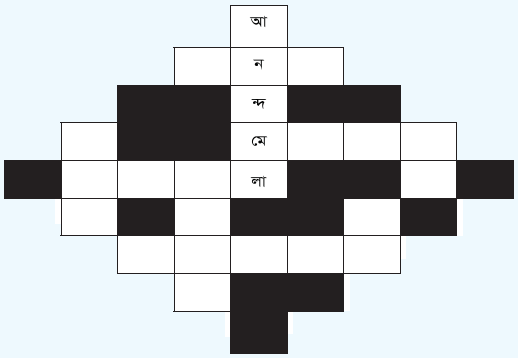

ব্রেইন ইকুয়েশন

৪	*		-	৭	=	
+		+		+		-
	/	২	+		=	৪
/		-		-		+
২	*		-	৫	=	
=		=		=		=
	-	১	*			৪

নাম্ব্রিক্স

৮১	৮০	৪৫	৪৪	২৯	২৮	২৭	২২	২১
৭৮	৭৯	৪৬	৪৩	৩০	৩১	২৬	২৩	২০
৭৭	৭৬	৪৭	৪২	৪১	৩২	২৫	২৪	১৯
৭৪	৭৫	৪৮	৪৯	৪০	৩৩	৩৪	১৭	১৮
৭৩	৭২	৭১	৫০	৩৯	৩৮	৩৫	১৬	১৫
৬৮	৬৯	৭০	৫১	৫২	৩৭	৩৬	১৩	১৪
৬৭	৬৬	৫৯	৫৮	৫৩	২	১	১২	১১
৬৪	৬৫	৬০	৫৭	৫৪	৩	৬	৭	১০
৬৩	৬২	৬১	৫৬	৫৫	৪	৫	৮	৯

m¤§vbx MÖnYi weÁwß

আগামীতে লেখক সম্মানী ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এজন্য সম্মানিত লেখকগণকে লেখার সাথে ব্যাংক একাউন্টের নাম, হিসাব নম্বর, ব্যাংকের নাম ও শাখা এবং রাউটিং নম্বর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। শিশুদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হিসাব নম্বর চালু করার অনুরোধ করা হলো।

সম্পাদক, নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড

ঢাকা-১০০০

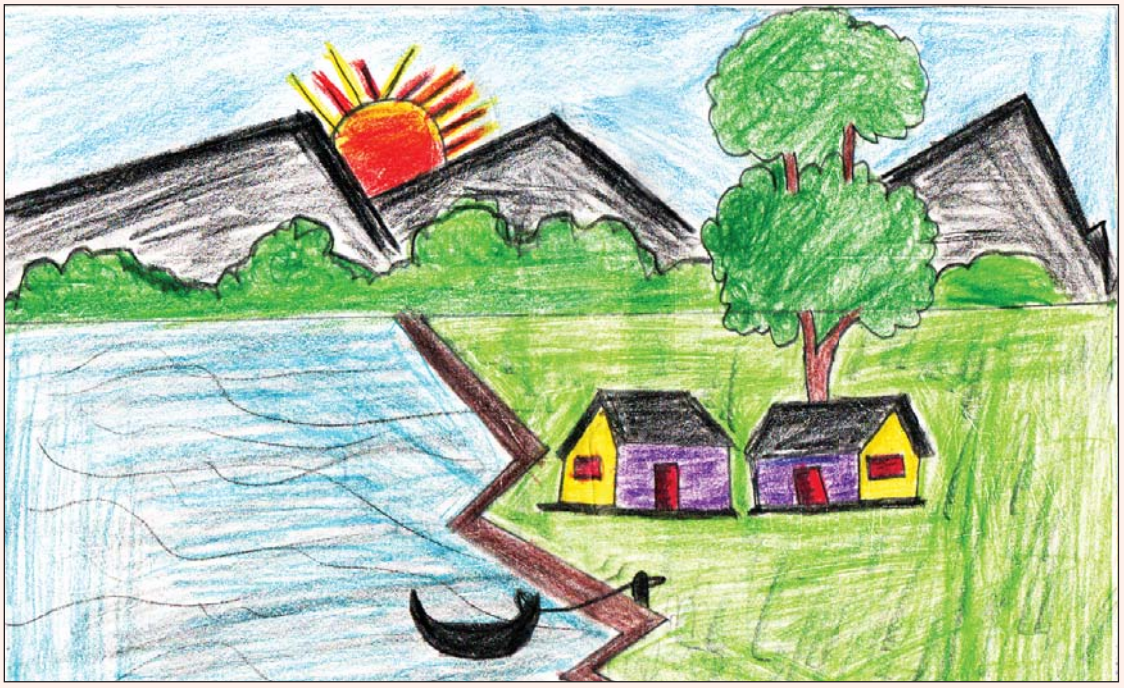

মোছা. একি, দশম শ্রেণি, স্টাফ কোয়ার্টার স্কুল, পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা

রুসাব আল খালিদ, নার্সারি, শহীদ বাবুল একাডেমী, খিলগাঁও, ঢাকা

সানজিদা আক্তার রুপা, নবম শ্রেণি, সাউথ সন্দ্বীপ আবেদা ফয়েজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মো. আবিদ, পঞ্চম শ্রেণি, ভোটমারী স্কুল এন্ড কলেজ, লালমনিরহাট

রাফসান হক, তৃতীয় শ্রেণি, কুর্মিটোলা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খিলক্ষেত, ঢাকা

জাকোয়ান খান, তৃতীয় শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

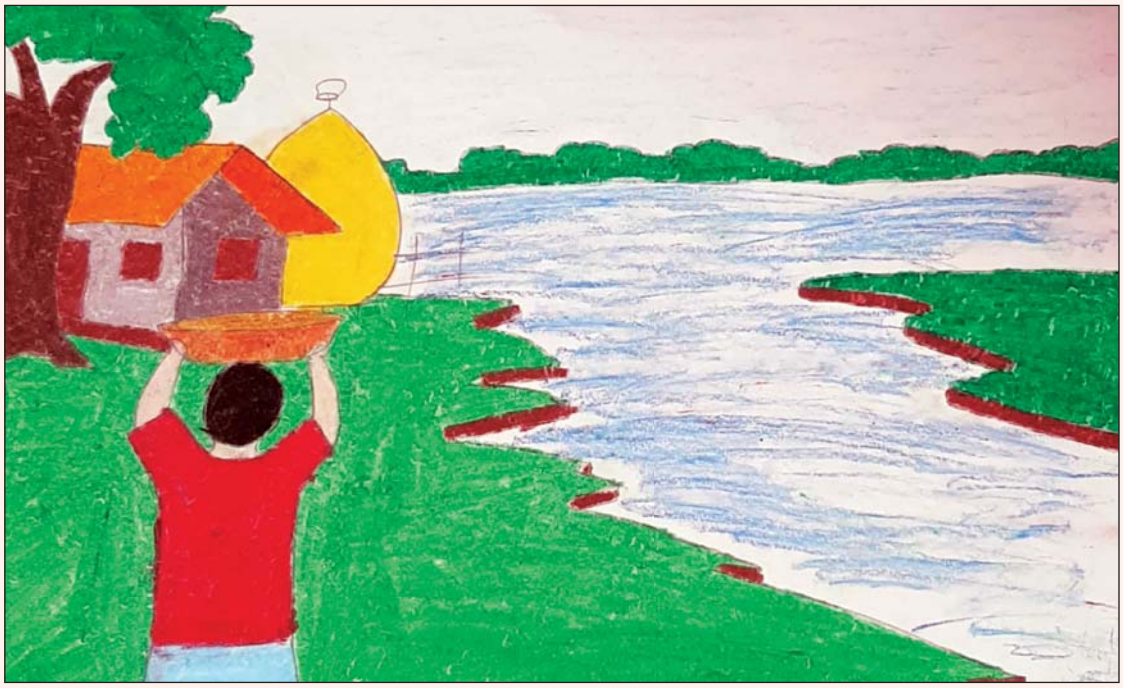

মো. তাহসিন ইসলাম রুহি, তৃতীয় শ্রেণি, বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল

শারিকা তাসনিম নিধি, চতুর্থ শ্রেণি, চিলড্রেন একাডেমি, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর

ডেঙ্গু প্রতিরোধে

সচেতনতা

- ❑ জমে থাকা পানি নিয়মিত অপসারণ করতে হবে
- ❑ চারপাশের জায়গা পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে হবে
- ❑ পানি জমে থাকতে পারে এমন জিনিসপত্র উলটে রাখতে হবে
- ❑ ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে
- ❑ জানালাতে মশা প্রতিরোধক নেট ব্যবহার করতে হবে
- ❑ শরীরের অনাবৃত স্থানে মশা নিবারক ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে
- ❑ মশা নিধনের ওষুধ, স্প্রে কিংবা কয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে
- ❑ পাতলা কিংবা ঢোলা পোশাক পরিধান থেকে বিরত থাকবেন
- ❑ শিশু এবং বয়স্কদের বিশেষ যত্ন নিয়ে নিরাপদে রাখবেন

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-48, No-05. November 2023, Tk-20.00

Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

সাফওয়ান-উজ-জামান মন, প্রথম শ্রেণি, যশোর ইনস্টিটিউট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা